লাল গোলাপ

- মাহমুদুল খান

টু টু টু। এক নাগাড়ে শব্দটা বেজেই যাচ্ছে। থামাথামির বালাই নেই। মহাবিরক্তিকর শব্দ। শব্দটা কি সত্যিই হচ্ছে, নাকি স্বপ্নে শব্দ শুনছে? এই যা, স্বপ্ন কি আর শোনার জিনিস? এ জিনিস হচ্ছে শুধুই দেখার। তাহলে শব্দটা সত্যিই হচ্ছে, নিশ্চিত হয় রফিক। আগের মতো চোখ বন্ধ রেখেই উষ্ণ পশমি লেপের নিচ থেকে বাম হাত বের করে শিয়রের কাছ থেকে আসা শব্দের উৎস হাতড়ে খোজে। পেয়েও যায় সঙ্গে সঙ্গে। বাটনে চাপ দিতেই আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। আহ, কি শান্তি!

এই ঘড়ি জিনিসটা, না না ঘড়ি না, ঘড়ি থেকে শব্দ করে এলার্ম বাজানোর আইডিয়াটা যার মাথা থেকে এসেছে তার গালে চল্লিশ জুতা। কেন রে ভাই, ঘুম ভাঙানোর জন্য যন্ত্রের সাহায্য কেন? প্রকৃতি তো এলার্ম সেট করেই রেখেছে। মোরগের ডাক, পাখির কুহুতান, ভাঙা বেড়ার ফাকফোকর গলে বেফাসে ঢুকে পড়া সূর্যের চিকন সতেজ আলোকরশ্মি অথবা শয্যাসঙ্গিনীর কোমল হাতের মৃদু ধাক্কা, ওগো, হ্যাগো, ওঠো না গো, এসবই কি যথেষ্ট নয়?

এবারের অদৃশ্য এলার্ম আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বিড় বিড় করে গালি দিতে শুরু করে রফিক। রোজই এ রকমটা করে সে। সর্বশেষ এবং নিকৃষ্টতম গালিটি যখন সে দেয় ঠিক তখনই ভেলকিবাজির মতো দুই চোখের পাতা থেকে নিদ্রাদেবী উধাও হয়ে যায়। আজকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শোয়া থেকে ঝাড়া দিয়ে ওঠে রফিক। এবং উঠতে উঠতেই প্রথমে ওপরওয়ালার দরবারে শোকর আদায় করে আরেকটা সুন্দর সকাল উপহার দেয়ার জন্য। এলার্মের অদৃশ্য এবং নাম না জানা আবিষ্কারককে একটা ধন্যবাদ দিতেও কার্পণ্য করে না সে। সামান্য একটু ধন্যবাদই তো, ট্যাক্স ফৃ। দিতে অসুবিধা কোথায়?

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। লস এঞ্জেলেস শহরে শীতকাল বলতে এই ডিসেম্বর আর জানুয়ারি মাস। ঘুম থেকে ওঠার পর বেশ শীত লাগলেও গোসল করার সঙ্গে সঙ্গে একদম শীত লাগছে না। দ্রুত জামা–কাপড় পরে বসার ঘরে আসে রফিক। সোফার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে ধ্বংস। টিভিটা এখনো চলছে। কাচের টেবিলময় ছড়ানো সিগারেটের ছাই আর ফিলটার। অ্যাশট্রে একটা আছে। কিন্তু সেটার অবস্থা ঢাকা শহরের ডাস্টবিনের মতো।

ধ্বংস হচ্ছে রফিকের রুমমেট। দেশ থেকেই অবশ্য তাদের মধ্যে পরিচয় ছিল। তার পুরো নাম আহমেদ দস্তগীর রুবেল। আমেরিকা আসলে সাধারণত ডালপালাওয়ালা বড় নামগুলো ঝেটেঝুটে সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে। মোহাম্মদ হয়ে যায় মি, কামরুদ্দিন হয়ে যায় কিম, মোসাদ্দেক হয়ে যায় ম্যাক্স। তা আহমেদ দস্তগীরের নাম কেটেছেটে অ্যামেড করা যেতো অথবা রুবেল হতে পারতো রব। কিন্তু হলো কি? ধ্বংস। সে এক বিচিত্র ইতিহাস।

বছর ছয়েক আগের কথা। সদ্য ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে রুবেল ঢাকা কলেজ থেকে। রেজাল্ট বেশ ভালোই, অল্পের জন্য স্ট্যান্ড করতে পারেনি। মেডিকাল কলেজ না হলেও ইউনিভার্সিটির ভালো কোনো বিষয়ে পড়ার সুযোগ করে নেয়ার যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা আর ধ্বংসের পথে কে পা বাড়ায়?

কিন্তু রুবেল পাড়ি জমালো আমেরিকার ওহাইও–র উদ্দেশ্যে। সরাসরি ওহাইওতে না গিয়ে লস এঞ্জেলেস–এ এক আত্মীয়ের কাছে স্টপবাই করার সিদ্ধান্ত নিল। একটু ঘুরে–টুরে নিলে পড়ালেখায় মন বসবে ভালো। এই শহরে আসার পর প্রথম রাতেই সে আত্মীয়টি তাকে নিয়ে গেল হলিউড বুলেভার ওপর এক রেসলিং ক্লাবে। মাড রেসলিং। মেয়েদের কুস্তি কাদার মধ্যে। কি তামাশা!

এরপরের গন্তব্য লাস ভেগাস। এল.এ থেকে মাত্র পাচ ঘন্টার ড্রাইভ। চোখে ছানি পড়ে যাবার মতো আলোকশয্যা, প্রায় নগ্ন উন্নত বক্ষা কামুক রমণীদের হাতছানি, ক্যাসিনোর স্লটিং মেশিন থেকে মুদ্রার ঝনঝনানি, মুফতে বিয়ার অথবা হার্ড লিকার। একেবারে পাগল হওয়ার জোগাড়। এই না হলে আমেরিকা? এই মেশিন থেকে ওই মেশিন, এই টেবিল থেকে ওই টেবিল, এই চাকতি থেকে ওই চাকতি, এ রকম করতে করতে মাঝ রাতের আগেই পকেটের সব ডলার হেরে নাঙা হওয়ার প্রয়োজন। অবশ্য থোড়াই পরোয়া করে রুবেল। *ভেঙেছিস কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না?*

লাস ভেগাসের সেই রাতের পাক্কা তিন মাস পর আহমেদ দস্তগীর কোনো এক নাইট ক্লাবে *কাইজা–ফ্যাসাদ* বাধিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ এক যুবকের চেহারার নকশা পাল্টিয়ে দেয়ার অভিযোগে সর্বপ্রথম গ্রেফতার হয়। তবে পকেটে যা টাকাকড়ি ছিল তার সৎকার করে ইনস্ট্যান্ট জামিনে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিও পেয়ে যায়। এই ঘটনার মাস ছয়েক পরে সান ফ্রান্সিসকো যাবার পথে পৌনে আট গ্রাম গাজাসহ দ্বিতীয়বারের মতো পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে। সেই যাত্রায় টানা তিন মাস জেল খাটতে হয় তাকে। জেল থেকে বের হওয়ার পর বাঙালিরা রুবেলকে দেখে আড়ালে ফিশফাশ করে আফসোসের সুরে বলতে শুরু করলো, আহারে! পোলাডা ধ্বংস হয়ে গেল।

ধ্বংস নামের পদযাত্রা সেখান থেকেই শুরু। যেই ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একদিন যে যুবক আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এসেছিল স্বপ্নের সোনার হরিণ ধরতে, ছয় মাসের মধ্যে সেই যুবক শুধু ধ্বংসের পথেই পা বাড়ালো না, নিজের নামটা পর্যন্ত হয়ে গেল *ধ্বংস।* নেশায় বুদ হয়ে ধ্বংস তার অতীত পাচালি গড় গড় করে আবৃত্তি করে। অন্য শ্রোতা না থাকলেও রফিককে তা মন দিয়ে শুনতে হয়। একবার, দুইবার না, অনেক অনেকবার। রাত যতো গভীর হয়, ধ্বংসের নেশার মাত্রা ততোই গভীর হতে থাকে। নেশা করে খানিক পর পরই ধ্বংস বলে ওঠে, *আমি ধ্বংস, খাই রাজ হংস।*

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জুতার ফিতা বাধতে উদ্যত হয় রফিক। আ, আ, উ, উ মাগো, বাবাগো... চিৎকার করতে করতে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে পর মুহূর্তে। রফিকের চিৎকার শুনে ধড়ফড়িয়ে ধ্বংস জেগে ওঠে।

কি, কি হয়েছে?

রগে টান লেগেছে, উহ্, হু।

আজকাল তোর তো প্রায়ই এ রকম হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে যাস না কেন? দেখি, দেখি, সোজা হয়ে শো। হ্যা। এইবার পা ভাজ, আবার সোজা। বেশ কয়েকবার পা ভাজ আর সোজা করার পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে রফিক।

দোস্ত, সরি, তোর ঘুম ভাঙালাম।

ইটস অলরাইট। হাই তুলতে তুলতে বেডরুমের দিকে চলে যায় ধ্বংস। বইয়ের ব্যাগ কাধে নিয়ে রফিকও ধীরে ধীরে পা বাড়ায়।

পাতালের পার্কিং লটে রাখা গাড়ি নিয়ে রফিক যখন রাস্তায় বের হয় তখন বাইরে ঝুম বৃষ্টি। বৃষ্টি তার খুব প্রিয়। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানো মোটেই সুখকর নয়। সুখকর না হলেও কিছু করার নেই। *ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়* কথাটা একেবারে একশ ভাগ ডাহা মিথ্যা। এই এখন যেমন রফিকের ইচ্ছা করছে গাড়িটা রেখে অন্য কোনো উপায়ে যেমন ধরা যাক, ট্যাকসি করে ক্লাসে যেতে। ইচ্ছা তো হচ্ছে। কিন্তু উপায়? পকেটে আছে মাত্র দুই ডলার।

সামনের উইন্ডশিল্ড ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। এক হাতে ডিফ্রস্টার আর সেই সঙ্গে ক্যাসেট প্লেয়ার অন করে দেয় রফিক। দেবব্রত বিশ্বাসের ভরাট কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে ওঠে, *তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।*

বাহ! রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তো তার বেশ মিল আছে। রবীন্দ্রনাথও তার মতো আমেরিকায় এসেছিল নাকি? আজ থেকে একশ দেড়শ বছর আগেও কি মানুষ *সোনার হরিণ* ধরতে চাইতো?

চাইতো, চাইতো। নিশ্চয়ই চাইতো। একশ বছর কেন, পাচশ বছর অথবা হাজার বছর আগেও চাইতো। হয়তো বা আজ থেকে পাচ হাজার বছর আগে রফিকেরই মতো কোনো এক যুবক সোনার হরিণ ধরার স্বপ্ন দেখতো। তখন আমেরিকা ছিল না। কিন্তু ছিল অন্য কোনো দেশ, অন্য কোনো সভ্যতা। রফিক আজকে উচ্চ শিক্ষা নিতে বিদেশ এসেছে। সেই যুবক হয়তো বা অন্য কোনো লক্ষ্যে বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়েছিল। যুবকের হয়তো অন্য কোনো অভিলাষ ছিল। সেই সময়ে তার জন্য সেটাই ছিল সোনার হরিণ। সেই সোনার হরিণ ধরার জন্য সে ছুটেছে দিন-রাত।

ছুটতে ছুটতে, এক সময় হয়তো হাতের নাগালে এসে গেছে সেই হরিণ। তবে ধরার পর সে বুঝতে পেরেছে তা সোনার হরিণ নয়, অন্য ধাতুতে গড়া। আবার দে ছুট। এভাবে ছুটতে ছুটতে কখন যে সময় ফুরিয়ে এসেছে তা বুঝতে পারেনি সে। হাজার বছর আগে তৈরি হওয়া সেই ছুটে চলা পথ আজও আছে। শুধু পরিবর্তন হয়েছে পারিপার্শ্বিকতার। রফিকও ছুটছে সেই সোনার হরিণ ধরতে। পারবে কি সে? হয়তো বা না। তবুও ছুটতে তাকে হবেই। না ছুটলেও তাকে এখন হাটতে হবে পার্কিং লট থেকে ক্লাস পর্যন্ত ব্যাগ কাধে, মাথার ওপর ঝুম বৃষ্টি।

লেকচার আর ল্যাব শেষ করতে করতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। ঘরে ফেরার সুযোগ হয় না রফিকের। সরাসরি কাজে চলে আসে। শুক্রবার এবং শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে পরদিন ভোর ছয়টা পর্যন্ত ভারমন্ট এবং সান্তামনিকার কোণায় এক সেভেন-ইলেভেনে কাজ করে রফিক। এই কাজের টাকা দিয়েই থাকা-খাওয়ার খরচ, পড়ালেখার খরচ তাকে চালাতে হয়। চলতে কি আর চায়। তবুও চালাতে হয়।

ছোটবেলায় গ্রামে দেখা এক লোকের কথা মনে পড়ে রফিকের। লোকটার নাম মতি খা। অভাব অনটনে মলিন, জীর্ণ, যায় যায় দিন দশার এক লোক। শত তালি দেয়া হাফ হাতা, নোংরা গেঞ্জির ওপর দিয়ে মতি খার শরীরের সব কটি হাড় এক এক করে গোনা যেতো। লোকটা গরুর গাড়ি চালাতো। মনিবের চেয়ে গরুগুলোর অবস্থা ছিল আরো করুণ। মাল বোঝাই করে মতি খার গাড়ি

সড়ক দিয়ে ক্যারক্যার করে চলতো। চলতে কি আর চায়? ক্ষণে ক্ষণেই মতি খা চিৎকার দিয়ে উঠতো হাট, হাট, তু, তু, ডাইনে–ডাইনে, বামে–বামে।

বর্ষার দিনে কাদা পাকলায় রাস্তাঘাট মাখামাখি। এরই মধ্যে কখনো কখনো মতি খার গাড়ির চাকা কাদার মধ্যে আটকে যেতো। যথারীতি মতি খার হুংকার। কঙ্কালসার গরু দুটোর পিঠে বাড়ির আঘাত। সপাং সপাংয়ের জায়গায় ঘটাং, ঘটাং। অবলা হলেও গরু দুটো মতি খার মতিগতি ভালোভাবেই বুঝতো। তাই তারাও প্রাণপণ চেষ্টা চালাতো এবং সেই সঙ্গে হাম্বা হাম্বা ডাক।

হাকডাক শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আটকে পড়া চাকা ধরে ধাক্কা দিতো এবং বলতো, উঠুক মতি খার গাড়ি।

এমনি কোনো এক বর্ষায় মতি খার প্রাণপ্রিয় দুই গরুর মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গরুটিই ইহ জগতের পাট সাঙ্গ করে পরপারে পাড়ি জমিয়ে হাপ ছেড়ে বাচলো। সন্তানতুল্য গরুর শোকে পাথর মতি খা দিন পনেরো পরে নিজে একই পথে যাত্রা করলো। মতি খার চল্লিশার ভোজটা হয়েছিল জীবিত গরুটার সদ্ব্যবহার করে।

মতি খার তো তবুও একটা গরু ছিল, পাড়া–পড়শি ছিল। কিন্তু রফিকের তাও নেই। আজকে যদি সে মারা যায় তাহলে কার এতো ঠেকা পড়েছে লাশ নিয়ে ছোটাছুটি করার? গরু জবাই করে চল্লিশা তো দূরের কথা, মুরগি জবাই করেও কেউ চল্লিশা করতে আসবে না। তবু কি আর করা! সোনার হরিণ তো তাকে ধরতেই হবে। কাজের ফাকে ফাকে এসব আবোলতাবোল ভাবে রফিক। ক্রেতা আসে–যায়, এটা কেনে তো ওটা ফেরত দেয়। বিড়বিড় করে বলে রফিক, উঠুক মতি খার গাড়ি। কিন্তু মুখে বলে অন্য কথা। হ্যালো, হাউ ইউ ডুইন, ফাইভ ও ফাইভ প্লিজ, থ্যাংকস, হ্যাভ এ নাইস উইকএন্ড।

সময়ের ঘোড়া ঘড়ি হয়ে রাশহীন ছুটে চলে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়, রাত হয় গভীর, আরো গভীর। এগারোটা, বারোটা, একটা, দুইটা। দুইটার পর বিয়ার বিক্রি বন্ধ। ক্ষণিকের জন্য হলেও নীরবতা নেমে আসে। চেয়ারটা টেনে একটু বসে রফিক। বসার সময় পকেটে ভাজ করা কাগজের অস্তিত্ব টের পায়। মনে পড়ে লতার চিঠির কথা তখনই। সেই কাল থেকে পকেটে চাপা পড়ে আছে, পড়ার সুযোগ হয়নি। লতা, মাধবীলতা। শত ব্যস্ততা আর ক্লান্তির মধ্যে যার কথা ভাবলেই খুব ভালোলাগায় ভরে ওঠে ভেতরটা। জীবন চলার অলি–গলির নোংরা পূতিময় আবর্জনা নিমেষে উধাও হয়ে যায়। অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎই আলো ঝলমলিয়ে ওঠে রফিকের পৃথিবীটায়।

খামের ওপর ঝকঝকে মুক্তার মতো হস্তাক্ষরে রফিকের নাম ঠিকানা লেখা। খুব যত্ন করে খামের এক পাশটা ছিড়ে চিঠিটা চোখের সামনে মেলে ধরে সে। বেলি ফুলের মিষ্টি সুবাস বাতাসে তরঙ্গায়িত হয়ে রফিকের নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করে। লতার খুব প্রিয় বেলি ফুল। প্রতিটি চিঠিতেই এ রকম বেলি ফুলের গন্ধ মাখা থাকে। চিঠি পড়তে শুরু করে রফিক –

মহামানব

সরি, সরি, সরি। তিনবার সরি বললাম। এই যে, কান ধরলাম। আর কখনো এমনটি হবে না, প্রমিজ। খুব গোস্বা হয়েছে, না? মহামানবরা কি কখনো কারো ওপর রাগ করে? কি করবো বলো? আমার মন চায় তোমার সঙ্গে সারাক্ষণ ফোনে কথা বলি। কিন্তু এটা তো আমাদের বাসার ফোন না। সেদিন যখন তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম তখন ওই বাসার ভাবি দরজার সামনে দাড়িয়ে বার

বার ইঙ্গিতে ফোন রাখতে বলছিলেন। তার হাজব্যান্ড নাকি চিটাগাং থেকে ফোন করবেন। হিংসা, বুঝলে না, হিংসা। পৃথিবীতে একজন মেয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে আরেকজন মেয়ে। মেয়েজাত বড় বজ্জাত। তোমার এই কথাটার সঙ্গে আমি নিরানব্বই ভাগ একমত। নিরানব্বই ভাগ কেন? কারণ হচ্ছে, মেয়েলোক জাতি বজ্জাত শুধু তোমার মধবীলতা বাদে। একশ মাইনাস এক সমান সমান নিরানব্বই। কি ঠিক বলিনি মহামানব?

এই মুহূর্তে আমি কোথায় আছি বলো তো? বলতে পারবে না জানি। সাত দিন হলো আমরা সব ভাইবোন মিলে গ্রামের বাড়িতে এসেছি। খুব মজা করলাম এ কয়েকদিন। আমাদের বাড়িতে এখনো ইলেকট্রসিটি আসেনি। আমার বাবা ইচ্ছা করেই আনেননি। বিজলি বাতিতে নাকি গ্রামের 'গ্রামত্ব' নষ্ট হয়ে যায়। কথাটা একশ ভাগ সত্য। এখন রাত আটটা, অথচ মনে হচ্ছে গভীর রাত। হারিকেনের মৃদু আলোতে বসে তোমাকে লিখছি। টেবিলের ওপাশে খোলা জানালা। মাঝে মধ্যে শিয়ালের হুক্কা হুয়া আর হুতোম পেচার ডাক। আমাদের বাড়িতে অনেক পুরনো তিন ব্যান্ডের একটা রেডিও আছে। রেডিওতে বাংলা সিনেমার গান হচ্ছে। বাংলা সিনেমার গান শুনতে যে এতো ভালোলাগে তা আগে জানতাম না। এই মুহূর্তে ঠিক কি গান হচ্ছে শুনবে? আচ্ছা শোনো – 'চিঠি দিও প্রতিদিন, চিঠি দিও, নইলে থাকতে পারবো না...'।

কি গানটা সুন্দর না? জানালা দিয়ে বাইরের বিশাল উঠান দেখা যাচ্ছে। উঠান ভরা জ্যোৎস্নার মেলা। উফ, কি যে সুন্দর! ভালোলাগা, অসহ্য রকমের ভালোলাগা। খুব ভালো লাগলে কি মানুষের কান্না পায়? আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আমি এখন কাদবো।

–মাধবীলতা

খুব যত্নের সঙ্গে ভাজ করে বুক পকেটে চিঠিটা রেখে দেয় রফিক। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয় দেশে যাবে সে। সোমবারে সবগুলো ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। মঙ্গল, বড়জোর বুধবারের মধ্যে... কৃং, কৃং, কৃং ফোনের আওয়াজে রফিকের চিন্তা বাধাগ্রস্ত হয়।

হ্যালো, রফিক? অন্যপ্রান্তে ধ্বংসের গলা শোনা যায়।

হ্যা, কি খবর?

একটা কারণে ফোন করেছি। কারণটা হচ্ছে যে, আমি হাস খাবো।

কি খাবি?

হাস, হংস। হাসের মাংস খেতে মন চেয়েছে খুব। ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, চায়না টাউনে গিয়ে জ্যান্ত একটা হাস জবাই করে নিয়েও এসেছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কিভাবে হাস রান্না করতে হয় তা আমি জানি না। তুই কি সকালে এসে...?

আর ইউ সিরিয়াস?

আলবৎ সিরিয়াস। আমি কি তোর শ্বশুরবাড়ির পক্ষের লোক নাকি যে, তোর সঙ্গে মশকরা করবো?

ঘটনাটা কি? তোকে বেশ খুশি খুশি লাগছে।

দোস্ত, দেশে যাবো বলে ঠিক করলাম। আর সেই উপলক্ষে নেশা করা আজ থেকে বন্ধ।

বলিস কি? কবে যাবি?

এ সপ্তাহেই।
আমিও এই মাত্র সিদ্ধান্ত নিলাম। আগামী মঙ্গলবার অথবা বুধবারের মধ্যে ফ্লাই করবো।
দারুণ। দুই বন্ধুতে মিলে ভালো মজা হবে।
তাহলে কালকে গিয়ে টিকেট কিনে আনবো।
ঠিক হ্যায়? আমাকে এখন রাখতে হবে। দোকানে এক চোলো হারামজাদা ঢুকেছে।
ওকে, সকালে দেখা হবে, বাই।
ফোন রেখে দোকানে আসা ক্রেতার দিকে নজর দেয় রফিক। ছেলেটির বয়স বিশ বাইশ হবে। বেটে করে পেটা স্বাস্থ্য। মেক্সিকান–আমেরিকান গ্যাং মেম্বার। স্থানীয় ভাষায় এদেরকে বলে *চোলো।* খুবই বিপজ্জনক এই গ্যাংয়ের সদস্যরা। শেলফ থেকে একটা স্নিকার চকলেট বের নিয়ে ক্যাশ রেজিস্টারের সামনে আসে ছেলেটা।
নাইন্টি নাইন সেন্টস প্লিজ। রেজিস্টারের বোতাম টিপে ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বলে রফিক।
পেছনের পকেটে হাত দেয়ার পরিবর্তে কোমরে হাত ঢোকায় চোলো। মুহূর্তে ডান হাতে শোভা পায় চকচকে পিস্তল। ক্যাচাক সেফটি ক্যাচ অন করার আওয়াজ হয় সেই সঙ্গে।
গিভ মি অল দি মানি অ্যাসহোল। হুংকার দিয়ে ওঠে চোলোর মেম্বারটি।
নিজের অজান্তেই দুই হাত উপরের দিকে ওঠায় রফিক আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। চোলোটির পিস্তল ধরা হাত একটু একটু কাপছে।
আন্ডালে, পুতো। তাড়া দেয় ছেলেটি। সেই সঙ্গে কাচ ভেদে করে বাইরের পার্কিং লটের দিকে ইতিউতি তাকায়।
বাম হাত ঊর্ধমুখে বহাল রেখে ডান হাতের তর্জনি দিয়ে ক্যাশ বাটন চাপ দেয় রফিক।
উ–উ–উ, আ–আ–আ, চোখ মুখ বিকৃত হয়ে আসে রফিকের। রগে টান দিয়েছে আবার। দাড়িয়ে থাকতে পারছে না সে। যন্ত্রণা, অসহ্য যন্ত্রণা। সেকেন্ডের জন্য সার্বিক পরিস্থিতি ভুলে যায় রফিক। হাটু ভাজ হয়ে আসছে। দুই হাত দিয়ে হাটু চেপে ধরতে উদ্যত হয় সে। জীবনের শেষ ভুলটা করে বসে সে সেই সঙ্গে।
সামনে দাড়ানো যমদূতের কম্পিত হাত থেকে আগুনের ফুলকি ঝলসে ওঠে। ঠুস, ঠুস, ঠুস। বুক পকেট ভেদ করে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে সেই আগুনের ফুলকি।
প্রচণ্ড বেগে কেউ যেন ধাক্কা মারে পেছনের দিকে। তাল সামলাতে পারে না রফিক। পড়ে যাচ্ছে সে। চক্রাকারে ঘুরছে সামনে দাড়ানো যমদূত, ঘুরছে দোকানের চার দেয়াল, ঘুরছে সামনের পৃথিবী। হারিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে সে সীমাহীন মহাশূন্যে। বুক পকেটে মাধবীলতার চিঠি। মাধবীলতা তার জন্য অপেক্ষা করছে। কতো কথা যে বলার ছিল মেয়েটাকে। আরে ধ্যাত, চিঠিটা আবার গেল কোথায়? হাতড়ে ফেরে রফিক। অনন্তকাল লেগে যায় বুক পকেট খুজে পেতে। এই তো, এই তো লতার চিঠি।
এ কি, চিঠি কোথায়? চিঠিটা যেখানে ছিল সেখানে ফুটে আছে টকটকে এক লাল গোলাপ। গোলাপের সিক্ত পাপড়িগুলো ধীরে ধীরে দিগন্ত অভিমুখে প্রসারিত হয়। সেই দিগন্তে দেখা যায় ছুটে

চলা এক চপলা হরিণ, সোনার হরিণ। এই তো সেই সোনার হরিণ। জগৎ জুড়ে আধার নামার পূর্বক্ষণে হাত বাড়ায় রফিক। কিন্তু ধরতে পারে না।

akash@sonalibangla.com
কানাডা থেকে

নকল স্বামী

– সাজেদা হোসেন

আমি শাহানা, ওরফে শানু কিছু কথা লিখতে বসেছি আপনাদের কাছে। গরিব পরিবারের এক অনূঢ়া কন্যা আমি। পিঠাপিঠি তিন বোনের মধ্যে আমিই বড়। স্কুল ফাইনাল পাস করার আগেই পড়া ছাড়তে হলো। প্রায় চার বছর ধরে বসে আছি বিয়ের অপেক্ষায়। গায়ের রঙটা চাপা হলেও দেখতে শুনতে যে আমি মন্দ না তা রাস্তায় বের হলে লোকজনের চাহনিতেই বুঝতে পারি। কিন্তু রূপের সঙ্গে কপালের জোর লাগে তাই বিয়ের বাজারে আমার দাম নেই কানাকড়িও। বাবা ছোটখাটো একটা চাকরি করেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মাস শেষে যা আনেন তা দিয়ে সংসারের হা মুখটা বন্ধ করা যায় না কোনো মতেই।

তবুও পাতলা খান লেনের এই ছোট খুপরি ঘরে আমরা তিনটি বোন জড়াজড়ি করে বড় হয়ে উঠেছি। বাইরের পৃথিবীটার কতো যে রূপ, রঙ তা দেখতে না পেলেও আশায় বুক বেধে আছি। স্বপ্ন দেখি, একদিন এই এদো গলি থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে কোনো এক রাজকুমার।

সেই রাজকুমারের ঘোড়ার খুরের খটখটানি শোনার জন্য কান পেতে থাকি। বাসন মাজতে মাজতে হয়ে যাই রূপকথার সেই সিনডারেলা যেন এখুনি শাদা ঘোড়ায় চেপে রাজকুমার এসে রূপালি পালকের পাদুকা পরিয়ে দিয়ে বলবে, বাহ! এই তো আমার হারিয়ে যাওয়া সেই প্রিয়তমা।

কিন্তু স্বপ্ন দেখাই সার। বাস্তব বড়ই কঠিন। মায়ের মুখের হাসি মুছে গিয়েছে। আর বাবাও যেন দিন দিন কুজো হয়ে যাচ্ছেন।

এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার দিকে বড় মামা এলেন। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমাদের অভাবের সংসারে আত্মীয়স্বজনেরা পারতপক্ষে পা মাড়ান না। আমি ছাদে শুকনো কাপড় তুলছিলাম। মেজ বোন রিনি দৌড়ে এলো। উত্তেজনায় সে হাপাচ্ছে।

আপু, তোমার বিয়ে, বর বিদেশে থাকে, বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে যাবে।

নির্বিকারভাবে শুনলাম। এরকম কতোই তো আসে। তারপর থেকে সেই।

কাপড়গুলো ওর হাতে দিয়ে ছাদে আরো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম।

কিন্তু নিচে নেমে দেখলাম ব্যাপার অন্যদিনের মতো না। মা বেশ প্রসন্ন মুখে মামাকে নাশতা দিচ্ছেন। বাবাও বেশ দরাজ গলায় কথা বলছেন। জানলাম আগামীকালই পাত্রপক্ষ আসছে কথা বলতে।

পরদিন ওনারা এলেন। আমাকে তাদের পছন্দও হলো। ঠিক হলো পাত্র দেশে এলেই বিয়ে হবে। বিদায় নেয়ার সময় বোন একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে আমাকে বললো, ভাইয়ার ছবি আছে এতে, দেখো।

দুরু দুরু বুকে খাম হাতে ঘরে এলাম। খাম খুললাম। কিন্তু একি! এতো মাঝ বয়সী এক টাকমাথা লোকের ছবি! কোথায় আমার স্বপ্নে দেখা রাজকুমার? স্তব্ধ হয়ে যাই। রিনি, মিনি দুজনে কল কল করতে করতে ঘরে ঢুকলো।

আপু ওদেশে গিয়েই একটা কালার টিভি পাঠিও আমাদের জন্য মিনি বললো।

আর আমার জন্য একটা ক্যামেরা। রিনি বললো।

আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না। কাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি। বিয়ের তোড়জোড় চলতে থাকে।

মা বাবা খুব খুশি। ওনাদের কতোদিনের স্বপ্ন প্রবাসী জামাই পাওয়া। কিন্তু একদিন শুনতে পেলাম পাত্র এখন বিদেশ থেকে আসতে পারবে না, কাগজপত্রে কি সব ঝামেলা আছে তাই। মা শয্যা নিলেন।

বড় মামা বললেন, কোনো চিন্তা নেই। টেলিফোনেই এ বিয়ে হবে।

কথা মতো বিয়ের অনুষ্ঠান টেলিফোনেই সারা হলো পাত্রের বোনের বাড়িতে। ফোনে আমার স্বামী মানে আজিজের সঙ্গে কথা হলো। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে নিয়ে যাবেন। তিনি বললেন।

দিন যায় বছর ঘুরে আসে। কিন্তু স্বামীর কাছে বিদেশ যাওয়া আমার হয় না। আমার স্বামীও আর আসতে পারলেন না এ দেশে।

মাসে একবার কি দুবার টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা হয়। এ কেমন বিয়ে! স্বামীর সঙ্গে ঘর করা তো দূরের কথা, চোখের দেখাটুকুও দেখলাম না।

মনমরা হয়ে শুয়ে বসে থাকি। কিছুই ভালো লাগে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে মা–বাবার মুখও শুকিয়ে আসে। ঘন ঘন বড় মামাকে খবর দেন।

একদিন বড় মামা এসে বললেন, এবার বোধহয় শানু মায়ের একটা ব্যবস্থা হলো। জামাইয়ের বন্ধুর ভাই জসিম যাচ্ছে ওদেশে। ওরই বৌ সাজিয়ে শানুকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

মা বাবা শংকিত, এটা কি ঠিক হবে?

কেন হবে না? শানু মাকে জামাইয়ের কাছে পাঠাতে এছাড়া তো আর কোনো উপায় দেখি না। ওর অবস্থাটাও তো তোমরা দেখবে। তাছাড়া জামাইয়ের যখন সম্মতি আছে তখন তোমাদের অসুবিধা কোথায়?

মামার জোরালো যুক্তি।

মা বাবা তবুও কিন্তু... কিন্তু করেন।

আমি আর কি বলবো? আমি তো নাচের পুতুল। ওনারা যেভাবে নাচাবেন সেভাবেই নাচবো।

যাওয়ার কাগজপত্র তৈরির কাজ শুরু হলো।

পরদিন সকালে আমার নকল স্বামী জসিম এলো। সুদর্শন! আমারই সমবয়সী।

ওর পিছু পিছু মোটর সাইকেলে গিয়ে বসলাম। মোটর সাইকেল আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো এখানে–ওখানে। সেই শুরু। তারপর মাঝে মধ্যেই বের হতে হয় জসিমের সঙ্গে।

ধূসর পৃথিবীটা হঠাৎ করেই যেন রঙিন হয়ে গেল আমার চোখে। প্রতি দিন সকালে জসিমের মোটর সাইকেলের শব্দের অপেক্ষায় কান পেতে থাকি। কারো সঙ্গ যে এতো ভালো লাগতে পারে তা আগে বুঝিনি। অবুঝ মনকে শত শাসন করেও বাগ মানাতে পারি না।

আমার এই ভালোলাগার দিনগুলো ফুরিয়ে গেল দ্রুত। এলো চলে যাওয়ার সেই ক্ষণ।
একদিকে মা–বাবা, দুই বোন এবং পরিচিত এই জগৎটাকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ, অন্যদিকে জসিমের সঙ্গে আসন্ন চিরবিচ্ছেদ বেদনা। সব মিলিয়ে হৃদয় আমার তীব্র ব্যথায় আচ্ছন্ন।
এক সময় দুর দুর বুকে ভীরু পায়ে জসিমের হাত ধরে প্লেনে উঠে বসলাম।
পেছনে পড়ে রইলো মধুর স্মৃতিমাখা কয়েকটা দিন।
চুপচাপ বসে রইলাম সারাক্ষণ।
জসিম কি কিছু বুঝতে পেরেছিল? বার বার জিজ্ঞাসা করছিল, ভাবী তোমার কি হয়েছে? কেন এতো মন খারাপ? কতোদিন পর স্বামীর কাছে যাচ্ছো, তোমার তো খুশি হওয়ার কথা।
সত্যি সত্যিইতো আমার স্বামী ঘর সাজিয়ে অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। আমার তো খুশি হওয়ারই কথা ছিল।

খিলগাও, ঢাকা থেকে

সঠিক সিদ্ধান্ত

- মিলন

বছর সাতেক আগের কথা। গ্রামে একটা কাপড়ের দোকান ছিল। আমরা গ্রামের অন্যান্য পরিবারের তুলনায় মোটামুটি সচ্ছল ছিলাম। আমরা মা–বাবা, দুই ভাই, স্ত্রী এদের নিয়ে মোটামুটি সুখীই ছিলাম। কিন্তু সুখী ছিল না আমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। তাকে সুখী করতে প্রায় প্রতি মাসে পরিবারের অন্য সবাইকে কিছু না দিয়ে শাড়ি, কসমেটিকস কিনে দিতাম। তবুও সে সুখী ছিল না। কারণ আমি যা কিনে দিতাম তা দামি হলেও দেশি।
পাশের বাড়ির শরিফ বিদেশে থাকে। তার বৌ বিদেশি কাপড় পরে। এতেই আমার বৌ–এর অশান্তি। আমাকেও বিদেশ যাবার জন্য চাপ দিচ্ছিল। এ নিয়ে মাঝে মধ্যে ঝগড়া হতো।
শরিফ কিছুদিনের জন্য দেশে এলো। তখন আমার বৌ–এর রাগারাগী আরো বাড়লো শরিফকে ধরে বিদেশে যাবার জন্য। এ নিয়ে বাড়ির সবার সঙ্গে তার ঝগড়া হতো। আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল। অবশেষে পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে বিদেশ যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।
রাতে সোহাগ করে বৌকে কাছে টানলাম। জানালাম তাকে বিদেশ যাবার কথা। সে তো মহাখুশি। অনেক দিন দাম্পত্য কাজ হয় না। বুকের আচল সরিয়ে ব্লাউজের বোতাম খুললাম। কিন্তু ব্লাউজ খুলে আমি অবাক। তার সুন্দর স্তনের ওপর কারুকাজ করা ব্রা। আমার অবাক দৃষ্টি দেখে বৌ বললো, শরিফ ভাই আমেনার (শরীফের বৌ) জন্য এনেছে। আমাকে একটা দিয়েছে আমেনা।
মনে দুঃখ পেলেও সেদিন স্থির করলাম বিদেশ আমি যাবোই।
এখন আমি বিদেশ ফেরত জামাই। বৌ–এর জন্য শুধু শাড়ি–গহনা নয়, সুন্দর সুন্দর ব্রা নিয়ে এসেছি। সে ব্রা আমাকে খুলতেও হয় না। বৌ নিজেই খুলে উন্নত বুক জোড়া আমার মুখে ডুবিয়ে দেয়।

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী থেকে

অন্য আরব

– মনির আহ্‌মেদ

বাংলাদেশে থাকতে আমাকে বলা হলো ফ্‌ ভিসায় সউদি আরব যাচ্ছি। ইচ্ছা মতো কাজ করা, ইচ্ছা মতো খাওয়া, ইচ্ছা মতো ঘুমানো।

এখানে এসে দেখি সব মিথ্যা। ফ্‌ ভিসা বলতে কোনো ভিসাই নেই। অনার অথবা কম্পানির কাজ করতে হবে। বেতন পাওয়া, না পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। যদি অনারের কাজ না করে বাইরে কাজ করতে হয় তাহলে অনারকে প্রতি বছরে কমপক্ষে দুই হাজার সউদি রিয়াল দিতে হবে। এছাড়া প্রতি বছর ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ করতে এক হাজার পাচশ রিয়াল খরচ করতে হবে। আর যারা কম্পানিতে আসে তাদের অবস্থা খুব করুণ। তিনশ রিয়াল বেতন থেকে প্রতি বছরের ওয়ার্ক পারমিটের জন্যে মাসে পঞ্চাশ রিয়াল করে কেটে নেয়। এরপরেও মাসের বেতন মাসে দেয় না।

আমি অনেককে দেখেছি, কোথাও থেকে একটা রুটি সংগ্রহ করে রাস্তার পাশের পানির ট্যাংক থেকে পলিথিনে করে পানি নিয়ে খেয়ে শুয়ে থাকে। এটা শুধু বাংলাদেশিদের বেলায় হয়ে থাকে। কারণ একমাত্র বাংলাদেশ থেকেই তিনশ রিয়াল বেতনে শ্রমিক আসে। আমাদের পাশের দেশ ইনডিয়া, শ্রীলংকা অথবা পাকিস্তান, নেপাল কোনো দেশের সরকার এই বেতনে তাদের দেশের লোক পাঠায় না। ফিলিপিন্স এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে দক্ষ অথবা অদক্ষ শ্রমিক যেই আসুক, সম্পূর্ণ খরচ তার বা কম্পানির। আর আমাদের দেশের হলো উল্টো। তবে এখানে বিদেশিদের বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট। বাংলাদেশ, ইনডিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের লোকেরা এক সঙ্গে খায়, ঘুমায়, মজা করে। ধর্মীয় দিকটা গৌণ, এমনকি ভৌগোলিক সীমারেখাও।

সউদিয়ানদের বেশির ভাগ লোকের মধ্যে মানবতা বোধ নেই। কোনো লোক রাস্তায় আহত অথবা নিহত অবস্থায় পড়ে থাকলে তারা ফিরেও তাকাবে না। পারিবারিক বন্ধন নেই বললেই চলে। বয়স্ক মা–বাবাকে ছেড়ে স্ত্রী–বাচ্চা নিয়ে আলাদা থাকে। বাংলাদেশের মতো একান্নবর্তী পরিবার তারা কল্পনাও করতে পারে না। তবে একটা জিনিস তারা প্রায় ঠিকভাবে পালন করে সেটা হলো, আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে গিয়ে ফরজ নামাজটা পড়ে। আরেকটা হলো, গাড়ি চালানোর সময় ট্রাফিক সিগনাল মেনে চলে।

তাদের সংস্কৃতি দেখলেই মাথা চক্কর মারে। অতিথি এলে, সন্তান জন্ম নিলে, কোনো সুসংবাদ শুনলে এরা উলুধ্বনি দেয়, ঢোল বাজায়, পায়ের তালুতে মেহেদি লাগায়। এখানকার পুরুষরা সোনার তৈরি কোনো জিনিস ব্যবহার করে না। সব মহিলাই বোরকা ব্যবহার করে, স্বভাব–চরিত্র যে রকমই হোক। তবে মহিলাদের স্বভাব–চরিত্র সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা আছে হাউস ড্রাইভারদের। আমরা যারা সেলসম্যান, আমাদেরও কম নেই। এগুলো লিখে মায়ের জাতিকে অপমান করতে চাই না।

বেশির ভাগ সউদিয়ান নেশা করার জন্য পাগল। নেশা জাতীয় সব জিনিস এখানে পাওয়া যায়। *বুলগারিয়া* নামে একটা সেন্ট আছে যেটা নেশার জন্য খুব জনপ্রিয়। আমাদের দেশের পেয়ারা গাছের কচি পাতার মতো এক ধরনের পাতা পাওয়া যায় যেটার নাম *গাত পাতা।* বুধবার, বৃহস্পতিবার এ দুই দিন অনবরত তারা এ পাতাই খাবে। এটা খেলে নাকি তাদের সেক্স বাড়ে। মজার ব্যাপার হলো,

সেক্স বাড়ানোর জন্য এতো কিছু করার পরেও তাদের অসংখ্য ব্যক্তির স্ত্রী মোবাইল ফোন এবং গাড়ির কল্যাণে বাইরের লোকের সঙ্গে সেক্স করে।

বাংলাদেশের মতো এখানেও দুর্নীতিবাজ পুলিশ আছে। তবে খুব কম। অবৈধ কাজে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে কিছু রিয়াল গুজে দিলে অন্ধকার রাস্তায় নিয়ে ছেড়ে দেবে। সাবধান থাকতে হবে, সাধারণ লোকজনের সামনে পুলিশকে রিয়াল দেয়ার চেষ্টা করলে আর বাচার উপায় থাকবে না। জেল জরিমানা সব হবে এবং শেষে যেতে হবে বাংলাদেশে।

রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে এরা কোনো আলাপ করতে চায় না। যদি কোনো কথা বলতে হয় তাহলে দরজা-জানালা বন্ধ করে ফিশ ফিশ করে কানে কানে বলবে যাতে তৃতীয় কেউ না শুনতে পায়।

মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জনের শেষ নেই। প্রবাসে জীবন যাপন করতে গিয়ে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব।

সউদি আরব থেকে

আইএনএস রেজিস্ট্রেশন

– এ নাসের খান

লেক শোর ড্রাইভে নেমেই দেখি চারদিকে তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। লবণ ছেটানোর গাড়িগুলোর অবিরাম পরিশ্রমের কারণে রাস্তাগুলো অবশ্য পরিষ্কার।

গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিয়ে মুনা হাসতে হাসতে বললো, তুষারের মতো তোমার মুখটাও কেমন শাদা, ফ্যাকাশে লাগছে।

তার কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। সত্যিই আমার মধ্যে একটা চাপা টেনশন কাজ করছিল। আজ ২৪ ফেব্রুয়ারি। কল ইন গ্রুপ ফোর-এর রেজিস্ট্রেশন শুরু। এ গ্রুপের মধ্যেই আছে বাংলাদেশ। ঘোষণাটা শোনার পর থেকেই মনের মধ্যে ক্ষোভ, দুঃখবোধ ও অনিশ্চয়তা কাজ করছিল।

এ দেশে আমার আসা চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর ট্রেনিং নেয়ার জন্য। আমার ভিসার ক্যাটেগরি জে-ওয়ান যার আরেক নাম এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ভিসা। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এবং কঠিন কঠিন পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়ে অবশেষে যখন এ দেশে এসে পৌছেছিলাম তখন প্রথমেই মুগ্ধ হয়েছিলাম এ দেশের লোকের উদারতা দেখে। এরা কাজ এবং মেধার মর্যাদা দিতে জানে বটে। জাত, বর্ণ, জাতীয়তাবাদ নির্বিশেষে যে কেউ পরিশ্রম ও মেধার কারণে উচ্চ পদে আসীন হতে পারে। ইওরোপে এমন ব্যাপারটি ঘটতে দেখিনি।

তিন বছর ইন্টারনাল মেডিসিনে রেসিডেন্সি ট্রেনিং শেষ করার পর এরা যখন বেছে বেছে আমার মতো একজন বিদেশিকেই চিফ রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে নিযুক্ত করলো তখন খুশির চেয়ে অবাক হয়েছিলাম বেশি।

ঢাকা মেডিকাল কলেজ থেকে পাস করা একটা ছেলে বসে বসে চাকরির ইন্টারভিউ নিচ্ছে খোদ আমেরিকানদের যাদের অনেকেই ডাক্তারি পাস করেছে পৃন্সটন, হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড-এর মতো ইউনিভার্সিটি থেকে! ব্যাপারটা বোধহয় শুধু আমেরিকাতেই সম্ভব। কিন্তু আমার এই আত্মতুষ্টি বেশি

দিন কপালে সইলো না। নিয়তির কি পরিহাস। এই ইন্টারভিউয়ারকেও আজ আইএনএস এ যেতে হচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে!

শিকাগোর ডাউনটাউনে ফেডারাল বিল্ডিংয়ের সামনে যখন এসে নামলাম তখন ঘড়িতে সকাল সাড়ে সাতটা। আর সবার মতো আমাকেও সিকিউরিটি চেক করে ভেতরে ঢুকতে হলো। এই বিল্ডিংয়ের দোতলায় আইএনএস–এর অফিস। স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন এর কথা বলতেই একজন একটি ওয়েটিং রুম দেখিয়ে দিল। এ ঘরটাতে দেখি ইতিমধ্যে সাত আটজন অপেক্ষা করছে।

একজন আইএনএস অফিসার মিষ্টি অভিবাদন জানিয়ে আমার হাতে একটা ফরম আর কলম ধরিয়ে দিল। ফরমে জানতে চেয়েছে, আমার নাম, বাংলাদেশের ঠিকানা, বাবা–মায়ের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার। আমেরিকাতে আমার কোনো সহকর্মী, আত্মীয় বা বন্ধুর ঠিকানা এবং এ দেশে আসার পর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমার সব বাসস্থানের ঠিকানা।

ফরমটা ফেরত দেয়ার সময়ে ভদ্রমহিলা আমার পাসপোর্টটিও চেয়ে নিলেন এবং জানতে চাইলেন, এ দেশে প্রথম কবে এসেছিলাম। আমার ফরমের ওপর ঘষ ঘষ করে লিখে রাখলেন তারিখটা। এরপর বললেন ডাক আসা পর্যন্ত বসে থেকে অপেক্ষা করতে।

ওয়েটিং রুমটা বেশ বড়। সারি সারি চেয়ার পাতা, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন বেশ আসতে শুরু করেছে। সঙ্গে নিয়ে আসা শিকাগো ট্রিবিউনটাতে চোখ বোলানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন বসলো না। অবশেষে আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম কয়েকজনের সঙ্গে। এদের কেউ পাকিস্তানি, জর্ডানি, ইন্দোনেশিয়ান। বেশির ভাগই স্টুডেন্ট ভিসা বা এইচ ওয়ান ভিসা নিয়ে এ দেশে আছে। সবার মধ্যেই চাপা ভীতিটা ধরার জন্য বেগ পেতে হয় না। দুই একজন দেখি আবার সঙ্গে করে ল'ইয়ার নিয়ে এসেছেন। এরই মধ্যে একজন দুজন করে ইন্টারভিউ দিয়ে বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। বের হচ্ছে সবাই হাসি মুখে এবং প্রতীক্ষারত আত্মীয় বন্ধুদের জানাচ্ছে ব্যাপারটা বেশ সহজ। যাক, কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া গেল।

প্রায় দুই ঘণ্টা বসে থাকার পর অবশেষে আমার ডাক এলো। একজন আইএনএস অফিসার আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। এ ঘরটি বেশ বড় এবং অনেকগুলো কিউবিকলে বিভক্ত। প্রতিটি কিউবিকলে একটি টেবিল ও দুই তিনটি চেয়ার পাতা। টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে একটি করে কমপিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং আঙুলের ছাপ নেয়ার জন্য ছোট্ট একটি ইলেকট্রনিক প্যাড।

প্রথমেই অফিসার আমাকে দাড়াতে অনুরোধ করে সত্যি কথা বলার শপথ নিলেন অফিসার। বসার পর জিজ্ঞাসা করলেন আমার ঠিকানা, জন্মস্থান, বাবা–মায়ের জন্ম তারিখ ও জাতীয়তা। এবং আমেরিকায় অবস্থানরত এমন তিনজনের নাম, ঠিকানা ও ফোন নাম্বার যাদের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক সমস্ত তথ্য তার কমপিউটারে এন্ট্র করছিলেন। আমার পরিচিতির প্রমাণ স্বরূপ চাইলেন ড্রাইভিং লাইসেন্স বা স্টেট আইডি এবং যে কোনো একটি মেজর ক্রেডিট কার্ড। জানতে চাইলেন, হাসপাতাল থেকে আমি কোনো চিঠি নিয়ে এসেছি কি না।

আমার পদমর্যাদা ও বাৎসরিক বেতন উল্লেখ করে যে চিঠিটি আমাদের প্রোগ্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমাকে দিয়েছিলেন সেটি অফিসারকে দেখালাম। এবার তিনি দেখতে চাইলেন আমার আইএপি–

সিক্সটিসিক্স অর্থাৎ ভিসা স্পন্সরশিপ সংক্রান্ত কাগজপত্র। পাসপোর্ট থেকে দেখে নিলেন শেষ আমেরিকায় প্রবেশের তারিখ এবং পাসপোর্টের মেয়াদ।

এরপর দুই হাতের তর্জনি একে একে রাখতে বললেন ফিঙ্গার পৃন্ট প্যাডের ওপর। ইলেকট্রনিকালি ফিঙ্গার পৃন্টিং হয়ে গেলে এবার আমার ছবি, তুললেন টেবিলে রাখা ডিজিটাল ক্যামেরাতে আমার পাসপোর্টে সংযুক্ত আইডেন্টিফিকেশনের নিচে লিখে দিলেন ফিঙ্গার পৃন্ট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার। অবশেষে আমার হাতে কিছু নির্দেশাবলীযুক্ত কাগজ ধরিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করলেন রেজিস্ট্রেশন পর্ব।

কাগজটিতে লেখা রয়েছে, আমাকে এক বছরের মাথায় আবার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং আমি যদি আমেরিকা ছেড়ে যাই তাহলে এয়ারপোর্টের আইএনএস অফিসে যাবার আগে হাজিরা দিতে হবে। যেসব এয়ারপোর্টে আইএনএস অফিস আছে তার তালিকা আইএনএস ওয়েবসাইটেই রয়েছে।

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন তো আমার সব তথ্যই আইএনএস–এর জানা। তাই দেশে গেলে নিশ্চয় তাড়াতাড়ি আমেরিকান ভিসা পাওয়া যাবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড চেকিংয়ের এক দুই মাস বসে থাকতে হবে না।

উত্তরে অফিসারটি জানালেন, তাদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুধুই অভ্যন্তরীণ তথ্যের জন্য। এমবাসি ভিসা ইসু করে স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষে এবং এ সমস্ত তথ্য আসলে ভিসা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে না।

ইন্টারভিউটি হলো প্রায় বিশ মিনিট জুড়ে এবং পুরো প্রক্রিয়াটির সময়ে আইএনএস অফিসারটি ছিলেন খুবই বিনয়ী ও ভদ্র।

ফেডারাল বিল্ডিং থেকে যখন বের হলাম তখন ঘড়িতে প্রায় সাড়ে দশটা। হাত থামাতেই একটা ক্যাব থেমে গেল ডিয়ারবোর্ন স্ট্রটের ওপর। চালককে দেখে মনে হলো পাকিস্তানি। বসার কিছু পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি, রেজিস্ট্রেশন করালে?

উত্তরে হ্যা বলতেই ফোস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভদ্রলোকের বুক থেকে।

কে জানে, আরো হাজারও ক্যাবচালকের মতো এই ভদ্রলোকের বোধহয় এ দেশে থাকার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বহু বছর আগে।

আজ তো আমার চিন্তার পালা শেষ হলো। কিন্তু এই ভদ্রলোকের মতো লাখো অভিবাসীর নতুন শংকা ও ভীতির কোনো অবসান হবে কি?

nasserkhan@hotmail.com
শিকাগো, আমেরিকা থেকে

লেখক নই পাঠক

– মোহাম্মদ আবুল খায়ের

ছেলেবেলায় মার্বল খেলা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সবগুলো খেলাতেই অংশ নিয়েছি দর্শক হিসেবে। কারণ যদি খেলাতে পরাজিত হই এই আশংকায়। আবার যখন থেকে গল্পের বই ও পত্রিকা

পড়া শুরু করেছি তারপর থেকে কখনো সাহস হয়নি পত্রিকায় ছাপানোর জন্য কোনো কিছু লিখে পাঠানোর।

দেশে সামান্য বেতনের চাকরি হলেও দুটি দৈনিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেতাম বিনা পয়সায়। প্রায় পাচ বছর প্রবাস জীবনে প্রত্যহ খবরের কাগজ পড়া থেকে বঞ্চিত। আমার চাকরিস্থল কুয়েত শহর থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে *জাহারা* নামে মরুভূমিতে একটি মিলিটারি ক্যাম্পাসে। সপ্তাহে মাত্র একদিন শহরে যাওয়ার সুযোগ হয় বাসযোগে। আমার প্রথম কাজটি হলো, পত্রিকার দোকানে কয়েকটি দৈনিক কাগজে চোখ বোলানো এবং একটি যাযাদি কিনে প্রথমেই সাত দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো পড়া।

দেশে মাত্র সাত টাকা খরচ করে প্রতি সপ্তাহে একটি যাযাদি কেনার সামর্থ না থাকায় সাইকেলে ছয় কিলোমিটার দূরে বন্ধুর বাসায় গিয়ে পড়তাম এবং বিশেষ সংখ্যাগুলো আমার প্রিয় মানুষটিকে পড়ানোর জন্য নিয়ে আসতাম। একটা কথা না বললেই নয়, দেশে স্বল্প মূল্যে যে পত্রিকা কিনতে পারতাম না তা এখন প্রায় দশগুণ দামে কিনে থাকি। প্রবাসে অধিক পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ থেকে খরচ করেও আমি সার্থক। কারণ এ যাবৎ যতোগুলো বিশেষ সংখ্যা পড়েছি যেমন প্রতি বছরের *ভালোবাসা* সংখ্যা, *ক্যামেরা, ছাতা, শাড়ি* বিষয়ক সবগুলো পর্ব আমার ভালোবাসার মানুষ ময়নাকে (ছদ্মনাম) কুরিয়ার যোগে পাঠিয়েছি। তবে *ফাল্গুনের ভালোবাসা* সংখ্যাটি থেকে তাকে বঞ্চিত করতে হলো বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে।

২০ মার্চ ২০০৩–এর সকাল দশটায় ইরাক থেকে আগত প্রথম ক্ষেপণাস্ত্রটি কুয়েতে এসে পড়ে আমার কর্মস্থল থেকে মাত্র একশ মিটার দূরে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত যতোবারই সাইরেন বেজেছে ততোবারই আমরা মুখোশ পরে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস সহকারে বাংকারে অবস্থান করি। এরই মাঝে ব্যাগের সাইড পকেটে রাখা ফাল্গুনের আকাশে বাতাসে ভালোবাসার রেশ সংখ্যাটি হারিয়ে ফেলি। দীর্ঘ পাচ বছরের প্রবাস জীবনে অনেক কিছুই হারিয়েছি। তবে এ বিশেষ সংখ্যাটি হারানোই আমার সবচেয়ে দুঃখের। কারণ এটি ময়নার কাছে পৌছাতে পারলাম না।

আরো একটা ছোট দুঃখ আছে, ইরাকে অ্যাংলো–আমেরিকান যৌথ বাহিনীর এই অন্যায় ও অনায্য আক্রমণের জন্য যাযাদি বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২২ ও ২৩ বিমানযোগে কুয়েতে আসতে পারেনি। এবং এই সংখ্যা দুটো পড়া থেকে আমি বঞ্চিত। তবে ২৪তম সংখ্যাটি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পাচটি চেকপোস্ট অতিক্রম করে দুই ঘণ্টা পায়ে হেটে বাস ধরে শহরে গিয়ে সংগ্রহ করেছি। এই সংখ্যায় মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত প্রবাসীদের পুনরায় লেখার সুযোগ দেয়ায় আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আমার এ লেখা ছাপা হোক বা না হোক, যাযাদি *প্রবাসী* সংখ্যা যতো পর্বেই বের হোক না কেন, শত প্রচেষ্টায় হলেও তা সংগ্রহ করে আমার ময়নার কাছে পাঠাতে পারি এই প্রার্থনা করবেন যাযাদিভক্ত লেখকই যার পাঠক এবং পাঠকই যার লেখকরা।

জাহারা, কুয়েত থেকে

দুষ্টুমি খেলা

– রহমান মোহাম্মদ মাসুদুর

জাপানের মতো একটা দেশে যে চুরি হতে পারে তা নিশ্চয় আপনারা কল্পনাই করতে পারেন না। জাপানে আসার আগে আমিও তা কখনো কল্পনা করিনি। যে দেশ আজ সত্য আর কর্মনিষ্ঠার প্রতীক হয়ে সারা বিশ্বের উদাহরণ হয়ে আছে সেই দেশে ওই চোর নামের শব্দটার সঙ্গে অন্যদের পরিচিত না হওয়াটাই ভালো। কারণ *চোর* শব্দের আভিধানিক অর্থ এখানে আমাদের দেশের থেকে আলাদা।

আমি ইউনিভার্সিটির পাট চুকিয়ে এখানে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু কপালে স্কলারশিপ না জোটায় নিজ খরচে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছেন, জাপানের মতো একটা ব্যয় বহুল দেশে নিজ খরচে পড়ালেখা করাই সব সময় একটা অর্থনৈতিক চাপ আমার মাথার ওপর সিন্দবাদের মতো চেপে থাকে। ঠিক ওই সময় বাংলাদেশি এক বড়ভাই জাপান থেকে চলে যাবার সময় তার হন্ডাটা আমাকে বিনা পয়সায় দিয়ে যান। অবশ্য বিনা পয়সায় দেয়ার যথার্থ কারণও আছে। প্রথমত জাপান থেকে কেউ চলে যাবার সময় তার যাবতীয় জিনিস রিসাইকল ফ্যাক্টরিতে জমা দিয়ে আসতে হয় এবং সেজন্য তাকেই আবার রিসাইকল ফ্যাক্টরিকে টাকা দিতে হবে, এটা তার জন্য এক ঝক্কি। এবং দ্বিতীয়ত. আমাকে তিনি বেশ স্নেহ করতেন। সে যাই হোক। হন্ডাটা পাওয়াই আমার বেশ উপকার হলো। কারণ তাতে আমি অল্প দূরত্বের যে কোনো জায়গায় নিজেই যেতে পারবো এতে আমার বাসের খরচটা বেচে যাবে। ওই আনন্দেই তখন আমি আত্মহারা।

গত বছরের শেষ দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২–এর সকাল। রৌদ্রোজ্জ্বল এক দিন। সাধারণত এই দিনটিতে এখানে সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ থাকে। সকালে ল্যাবের টুকটাক কাজ সেরে হন্ডাটা আমার ডর্মিটরির নিচে পার্ক করে ফুরফুরা মন নিয়ে রুমে চলে আসি। বিকেলে ইউনিভার্সিটির জিমনেশিয়ামে ব্যাডমিন্টন খেলার উদ্দেশ্যে নিচে পার্ক করা হন্ডাটার দিকে স্বভাবসুলভ মতো এগুতে থাকি। কিন্তু হন্ডাটা যথাস্থানে না থাকায় প্রথমে যা করলাম তা হলো, বাচ্চারা যেভাবে পেন্সিল খোজে ওই ভাবে আমিও আমার হন্ডাটা খুজলাম। এর মধ্যে একবারও মনে হয়নি যে হন্ডাটা চুরি হতে পারে। বার বার মনে হচ্ছিল, আমিই কোথাও ভুল করে হন্ডাটা রেখে চলে এসেছি।

অনেকক্ষণ পর বুঝতে পারলাম আসলেই চুরি হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, আমার হন্ডা চুরি হয়েছে, অথচ আমার মনের মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই। আমার কাছে বার বার মনে হচ্ছিল, এ হতেই পারে না।

কালক্ষেপণ না করে রুটিন মাফিক পুলিশ বক্সে গিয়ে রিপোর্ট লিখে এলাম। আমার কাছ থেকে হন্ডাটার সমস্ত বিবরণ তারা খুটে খুটে লিখে রাখলো এবং তিন দিনের মধ্যেই আমাকে তারা রিপোর্ট করবেন বলে আশ্বস্ত করলো।

জাপানিজ পুলিশের সুনাম অনেকেরই জানা। তাই মনে একটা শান্তি নিয়ে আমার রিসার্চ কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ল্যাবের কাজের চাপে হন্ডাটার কথা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু জাপানের স্মার্ট পুলিশ ঠিক তিন দিনের মাথাই আমাকে ফোন করে জানালো যে, হন্ডাটা পাওয়া গেছে। হন্ডাটা আমার হাতে বুঝিয়ে দেয়ার সময় তারা এমনভাবে বার বার আমার সাময়িক

অসুবিধার জন্য লজ্জিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছিল যে, তাদের জন্য আমারই মায়া লাগছিল। আমি যতোবারই তাদের বোঝাই যে, আমার তেমন একটা অসুবিধা হয়নি, তারা আমার কোনো কথাই শোনে না।

ক্ষমা প্রার্থনার পর্ব শেষ করে তারা আমাকে জানালো যে, ৩১ ডিসেম্বর উপলক্ষে দুষ্টু ছেলেরা আমার হন্ডাটা নিয়ে একটু মজা করার জন্য নিয়ে এসেছিল এবং তারাই আবার মজা করা শেষে হন্ডাটা রেল স্টেশনের গারাজে রেখে গেছে। পুলিশ সেখান থেকে হন্ডাটা উদ্ধার করে।

হন্ডাটা নিয়ে আসার সময় আমার বার বার মনে হচ্ছিল, এ যেন জাপানি পুলিশ আর দুষ্টু ছেলেদের মাঝে দুষ্টুমি দুষ্টুমি খেলা। এবং আমার হন্ডাটা ছিল তাদের খেলার উপকরণ।

জাপান থেকে

বর্ডার

– আশরাফুল ইসলাম রুবেল

ওঠো ওঠো তোমরা খেয়ে নাও, তোমাদের ইনডিয়ায় ফেরত পাঠানো হবে। এ কথা শোনার পর আমার মন মুক্তির আশায় ছটফট করতে লাগলো। একজন লোক এসে কিছু কাগজ সই করিয়ে নিয়ে গেল। এবং একজন রুটি এবং তরকারি দিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে বললো। তেরো দিনের এই অন্ধকার রুমে পাকিস্তানের সাকার জেলার এক রেঞ্জার (সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী) অফিসে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আমরা বন্দী।

আমাদের দুজনার চোখ বেধে রেঞ্জারের একটি জিপে করে ইনডিয়ার সীমানার দিকে নিয়ে যেতে থাকলো। বাঙালি হিসেবে আমাদের অনেক গালাগালি করলো। বললো, তোরা গাদ্দার, ইনডিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তোরা পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করেছিস। আবার এসেছিস পাকিস্তানে নাশকতামূলক কাজ করতে।

ইনডিয়ার প্রতি এতো বিদ্বেষ, অথচ জিপের ভেতর তখন হিন্দি ফিল্মের চটুল গান বাজছে। আর সবাই তার সঙ্গে সুর মেলাচ্ছে। চোখ বাধা অবস্থায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জিপ চলার একঘেয়ে আওয়াজ এবং হিন্দি গান ছাড়া অন্য কিছুই কানে আসছে না। গান শুনতে শুনতে অতীতের কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো।

১৮ অক্টোবর ২০০০ হিলি সীমান্ত হয়ে এক মাসের ভিসা নিয়ে ইনডিয়া এলাম। উদ্দেশ্য, ইনডিয়ায় পৃথিবীর অনেক দেশের দূতাবাস আছে যদি কোনো ভালো দেশের ভিসা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ দূতাবাস এলাকা ঘুরে ঘুরে কোনো ভিসা না পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম ইনডিয়া, ইরান অথবা সিরিয়ার ভিসা পেলে টার্কি হয়ে ইওরোপ যাবো। ইরানে আলী নাম খুব জনপ্রিয়। তাই মোহাম্মদ আলী, পিতা আরজ আলী এই নামে পাসপোর্ট বানালাম। দিল্লি গিয়ে এ দুই দূতাবাসে গেলাম। তারা বললো, তোমাদের দূতাবাস থেকে যদি রিকোয়েষ্ট লেটার আনতে পারো তবে তোমাদের ভিসা দেবো।

আমাদের দূতাবাসে কয়েকবার গেলাম। জনপ্রতি তারা পাচশ ডলার করে চাইলো। হায়রে দূতাবাস। যেখানে আমরা বিভিন্ন পথে বিদেশ গিয়ে দেশের ভাণ্ডারে অর্থ পাঠাচ্ছি অথচ তারাই বলছে, আপনারা

তো আর ফিরে আসবেন না। পাচশ ডলার করে দিলে রিকোয়েষ্ট লেটার পাবেন। কারণ আপনারা বিদেশে অনেক টাকা উপার্জন করবেন। পয়সার অভাবে আর.এল পেলাম না। কিন্তু অন্য এক গ্রুপ, দলে পাচজন আমাদের সামনে টাকার বিনিময়ে আর.এল এবং ভিসা নিয়ে চলে গেল। এই হলো বিদেশে আমাদের দেশের দূতাবাসের নমুনা। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যদি কোনো রাস্তা থাকে তাহলে অবৈধ পথে পাকিস্তান হয়ে ইরানে যাবো।

পাঞ্জাব রাজ্যের ওয়াগা বর্ডার একমাত্র রাস্তা যার মাধ্যমে ইনডিয়া এবং পাকিস্তানের মধ্যে সমস্ত বৈধ যাতায়াত হয়। পাকিস্তান দূতাবাসে গেলাম। তারা বললো, কোনো বাংলাদেশিকে ভিসা দেয়া নিষেধ। পাঞ্জাব হয়ে টুরিস্ট বাসে ওয়াগা বর্ডারে গেলাম। টুরিস্টরা দেখছে দুই দেশের সুন্দর মার্চ পয়েন্ট আর আমরা দেখছি দুই দেশের সীমান্ত। পৃথিবীতে এতো দুর্ভেদ্য সীমানা মনে হয় অন্য কোনোটি নয়। দুই পাশে কাটাতারের বেড়া ও মাঝখানে প্যাচানো পাকিস্তান কাটা তারের বেড়া এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কারেন্ট তাতে প্রবাহিত হচ্ছে। মাঝে মধ্যে উচু চৌকি কিছু দূর পর পর সার্চলাইট এবং পায়ে হেটে বিএসএফ পাহাড়া দিচ্ছে। মনটা দমে গেল, কিছুতেই এ বর্ডার পার হওয়া যাবে না। সেদিন ছিল ইনডিয়ার বড় উৎসব *দেওয়ালী* বা *দীপাবলী*।

স্বর্ণ মন্দিরে প্রচুর লোক সমাগম। আমরাও সারা রাত তাদের সঙ্গে আনন্দ করলাম। এরই মাঝে হঠাৎ এক বাঙালিকে পেলাম। সে নাম বললো আলতুমিয়া বয়স পয়তাল্লিশ–এর মতো। সে বললো, সে প্রায় অনেক বছর যাবৎ বর্ডার ক্রস করে পাকিস্তান যাতায়াত করেছে। কিন্তু বর্তমানে পাঞ্জাবের বর্ডার খুব শক্ত। উনিশ বিশ বছরের একটি মেয়ে এবং রুগ্ন একটি শিশুকে দেখিয়ে সে বললো, এ আমার স্ত্রী ও সন্তান। আমি এদের পাকিস্তান নিয়ে যাবো। স্বর্ণ মন্দিরে থাকা–খাওয়া ফৃ। তাই এখানে আছি। সুযোগ পেলেই পাকিস্তান নিয়ে যাবো।

তখনই মনে পড়লো নারী ও শিশু পাচার করার কথা। মেয়েটি জানে না তাকে পাকিস্তান নিয়ে কোথায় বিক্রি করা হবে। বাচ্চাটি বা কোথায় পরে মরে থাকবে? আলতুমিয়া আমাদের বললো, আপনারা রাজস্থানের জয়সালমের জেলার সীমান্ত হয়ে পাকিস্তানে যান। যেখানে মরুভূমিতে চেক কম এবং কোনো কারেন্ট নেই। উঠের পিঠে বসে বিএসএফ গার্ড দেয়। বেশি করে পানি এবং শুকনো খাবার সঙ্গে নেবেন।

তার কথা মতো পরের দিন দিল্লি হয়ে আজমীর গেলাম খাজাবাবার মাজার জিয়ারত করার জন্য।

আজমীর থেকে বাসে গেলাম জয়সালমের জেলার *রামগড়* নামে জায়গায়। তখনো আমরা জানি না, কি বিপজ্জনক এলাকায় আমরা প্রবেশ করেছি। এখানকার জনগণের চেয়ে বিভিন্ন গুপ্তচর এজেন্সির লোক বেশি সক্রিয়। কারণ এ জেলার পোখরান–এ ইনডিয়া পারমাণিক বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। মোহাম্মদ নামের এক জিপ ড্রাইভারকে রাজি করালাম বর্ডার পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে নিভু নিভু করছে তখনই আমরা পৃথিবীর এক বড় মরুভূমি, থর মরুভূমির মাঝে পাকিস্তানের সীমানার চার পাচ কিলোমিটার আগে নামলাম। রামগড় থেকে আমরা প্রচুর পানি, বিস্কিট ও চকলেট নিয়েছি, আরো কিনেছি আজমীর থেকে কাটার, টেস্টার, দিকদর্শন যন্ত্র, টর্চলাইট ইত্যাদি।

মোহাম্মদ আমাদের বললো, এই মরুভূমিতে প্রচুর বাঙালি মহিলা, বাচ্চা,পুরুষ পানির অভাবে মরে পড়ে আছে।

শ শ কিলোমিটার কোনো জনমানব নেই, শুধু বালু আর বালু। দেখে বুকটা কেপে ওঠে যা আগে কখনো দেখিনি। এক টুকরো রুটির আশায় কতো বাংলাদেশি এ মরুভূমিতে প্রাণ দিয়েছে তা কি কেউ খোজ রেখেছে? অনেক কাপড়ে ব্যাগ আমাদের ভারী ছিল। তাই কিছু কাপড়–চোপড় মোহাম্মদকে দিয়ে বিদায় দিলাম।

সূর্য ডুবে যেতেই মনে হলো আমি এক কমান্ডো। হাতে পানির গ্যালন, পিঠে ব্যাগ নিয়ে মাসুদ রানার মতো ছুটে চলেছি মরুর উচু–নিচু বালুকাময় পথে অজানার উদ্দেশ্যে। কিছু দূর যাই আর বিশ্রাম নিই, পানি খুব কম করে পান করি। কারণ মরুভূমিতে এই পানিই একমাত্র ভরসা। প্রায় ঘণ্টা দুই তিন হাটার পর নয় দশটার দিকে বর্ডারের লাইট নজরে পড়লো।

বর্ডার থেকে কিছু দূরে বালুতে শুয়ে পড়লাম যাতে আমাদের কেউ না দেখে। গভীর রাতে বর্ডার পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলাম। দুইজন সৈন্য ঘণ্টা খানেক পরে চিৎকার করতে করতে পাহারা দিতে চলে গেল। চোখ লেগে এসেছিল। তাই ঠাণ্ডায় চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বারোটার দিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আস্তে আস্তে কাটাতারের কাছে গেলাম এবং লাইটপোস্টের কাছে বসে টেস্টার দিয়ে দেখলাম তারে কারেন্ট আছে কি না। কারেন্ট না থাকাতে কাটার দিয়ে ইনডিয়ার দিকের এক তার ও পাকিস্তানের দিকের এক তার কাটলাম এবং দ্রুত পাকিস্তানের ভেতর প্রবেশ করলাম। কিছু দূর দৌড়ানোর পর বালুতে বসে পড়লাম। বিস্কিট এবং পানি খেলাম। বিশাল মরুভূমির কোন দিক যাবো কিছুই বুঝতে পারছি না। চারদিকে শুধু বালু আর বালু, যেদিকেই যাই কোনো রাস্তা পাই না।

এখানে বলে রাখা ভালো, ইনডিয়া তার সীমানা এমনভাবে সিল করেছে যে একটি পাখিরও তার দেশে প্রবেশ বা বের হওয়া অনেক কঠিন। অথচ এ সীমানায় পাকিস্তানের তেমন চেক নেই। আমরা সকাল হাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম এবং দিনের বেলা আলোতে সব কিছু দেখে পথ চলার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাতে মরুঝোপের ভেতর লুকিয়ে থাকলাম আবার মরু সাপের ভয়ও করতে লাগলাম। এভাবেই সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো, আমরা দুজন ছাড়া অন্য কোনো জনমানব চোখে পড়লো না। শুধু জানি ইনডিয়ার পশ্চিমে পাকিস্তান। তাই সূর্য যখন পশ্চিমে লাল হয়ে এলো তখনই কোনো মানুষের ভয় না করে সোজা সূর্যের দিকে হাটতে শুরু করলাম। যখন রাত নেমে এলো তখনো আমরা হাটছি এবং বিশ্রাম নিচ্ছি।

এভাবে কতোক্ষণ হাটছি জানি না। হঠাৎ হালকা আলোকরশ্মি নজরে এলো। ভাবলাম হয়তো কোনো গ্রাম। তাই সেদিকে হাটা শুরু করলাম। অনেকক্ষণ হাটার পর আলোার কাছে এসে দেখি এটি একটি গ্যাস ক্ষেত্র। অন্য একটি কূপ খননের কাজ চলছে। একই গ্যাস ক্ষেত্রের দুটি মুখ, একটি ইনডিয়ায় যা দিয়ে সে রামগড়ে তাপবিদ্যুৎ তৈরি করছে। অপরটি পাকিস্তানে। সবাই চাচ্ছে এ ক্ষেত্র থেকে নিজে বেশি গ্যাস উত্তোলনের। অথচ বাংলাদেশ ও ইনডিয়ার অভিন্ন গ্যাস, তেল ক্ষেত্রগুলো আমরা অবহেলায় ফেলে রেখেছি, দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে যার সুফল ইনডিয়া ভোগ করছে। এবং সে দ্রুত তা থেকে তেল ও গ্যাস আহরণ করছে। এভাবে আমাদের মূল্যবান সম্পদ আমরা হারাচ্ছি।

গ্যাস ক্ষেত্রের পাশে প্রচুর গরু এবং ছাগলের পায়ের আওয়াজ শুনলাম এবং একটি পাকা রাস্তা পেলাম। রাস্তার পাশে একটি প্লাস্টিক ড্রামে পানি পেলাম। সেখান থেকে আমরা পানি ভরে নিলাম।

সামনে চেকপোস্ট দেখে বালুর ভেতর দিয়ে ঘুরে সামনে পাকা রাস্তায় গিয়ে উঠলাম। চলতে চলতে মাইলফলক দেখলাম, লেখা আছে KHENGU 11 Km. কিছুদূর গিয়ে পানির নালা পেলাম। ভাবলাম পানি যখন আছে তখন অবশ্যই গ্রাম আছে। এবং মরুভূমি এখানেই শেষ। তাই ওখানেই এক ঝোপের ভেতর তৈরি বাংকার পেয়ে শুয়ে পড়লাম। সারা দিন গ্যাস কম্পানির ট্রাক ও অসংখ্য গরু চরাতে দেখলাম।

সূর্য ডুবে গেল। পাকা রাস্তায় আবার চলা শুরু করলাম। বিশ্রাম নেয়ার পথে দুজন রেঞ্জারকে চলে যেতে দেখলাম। পরে জেনেছি ইনডিয়ার ইনফরমেশন পেয়ে আমাদের খুজতে বের হয়েছিল তারা। দুই চার ঘণ্টার মতো চলার পর আমরা গ্রামে প্রবেশ করি এবং মরুভূমি শেষ হয়।

এভাবে গ্রামের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে আমরা রেঞ্জার অফিসের চেকপোস্টের কাছাকাছি চলে আসি। বহু দূর ঘুরে চেকপোস্ট পার হয়ে দুই তিন ঘণ্টা হাটার পর একটি পেট্রল পাম্প নজরে আসে। সিদ্ধান্ত নিই এখান থেকেই বাসে উঠে কোনো বড় শহরে যাবো। তাই পাম্পের পেছনে কার্পাস তুলার ক্ষেতে আমরা বসে পড়ি। সকাল নয় দশটার দিকে ময়লা পোশাক ছেড়ে নতুন কাপড় পরি এবং রাস্তায় গাড়ির জন্য দাড়াই। পিকআপের মতো একটি গাড়ি দেখে হাত তুলি থামার জন্য। গাড়ি থামলে বলি, আমরা বড় শহরে যাবো।

তারা প্রশ্ন করে, তোমরা কারা।

আমরা বলি বাংলাদেশি।

গাড়িতে সম্ভবত সিভিল রেঞ্জার ছিল, তারা আমাদের গাড়িতে উঠতে বলে। আমরা গাড়িতে উঠলে গাড়ি ঘুরে সোজা রেঞ্জার অফিসে যায় এবং বলে ইনডিয়ার গুপ্তচর ধরেছি।

গাড়ি থেকে আমাদের নামিয়ে একটি ঘরের সামনে নেয় এবং শার্ট খুলে আমাদের চোখ বেধে ফেলে। এক এক করে আমাদের সব সার্চ করে। ব্যাগ সার্চ করে। ব্যাগে পাসপোর্ট ছিল, তা দেখে বলে এটা আসল না নকল, কেন এসেছি পাকিস্তানে, ইনডিয়া কতো টাকা দিয়েছে আমাদের ইত্যাদি।

এরপর চোখ বাধা অবস্থায় আমাদের জিপে করে সাকার জেলার রেঞ্জারের বড় অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাদের সমস্ত কাপড়–চোপড় খুলে নিয়ে চোখ বাধা অবস্থায় এক রুমের ভেতরে রাখা হয়। ঘণ্টা খানেক পর চোখ খুলে দিয়ে কাপড় পরতে বলা হয় এবং অন্য একটি রুমে চোখ বেধে নিয়ে যাওয়া হয়। রুমে প্রবেশের পর চোখের বাধন খুলে দেয়া হয়। সেখানে কয়েকজন বড় অফিসারকে দেখতে পাই। তারা প্রশ্ন করেন, তোমরা কারা, কেন এসেছো পাকিস্তানে, কিভাবে এসেছো। আমরা বলি, আমরা বাংলাদেশি, ভিসা না পাওয়াতে বর্ডারের তার কেটে পাকিস্তানে আসি ইওরোপ যাবো বলে।

তখন একজন বড় অফিসার বলেন, হ্যা, এরা সত্য কথা বলছে, এদের ব্যাপারে ইনডিয়া আমাদের জানিয়েছে যে দুজন বাংলাদেশি তার কেটে তোমাদের দেশে প্রবেশ করেছে।

তখন আমি বললাম, স্যার, আমাদের বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে হস্তান্তর করা হোক, আমরা টিকেট কেটে বাংলাদেশ চলে যাবো।

তিনি বললেন, আমাদের হাতে কোনো কিছু নেই, পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী তোমাদের বিচার করা হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে। এই বলে চোখ বেধে আবার প্রথম রুমে নিয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর একজন ডাক্তার এলো। ডাক্তার চেক করে কোনো অসুবিধা আছে কি না জানতে চাইলো।

এরপর একজন লোক এসে আমাদের সমস্ত মাল এবং টাকা ডলারের লিস্ট নিয়ে এসে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে গেল ও আমাদের কোনো চিন্তা করতে মানা করলো।

কিছুক্ষণ পর চিড়িয়াখানার জীবের মতো সবাই আমাদের দেখতে আসছে, সামনে দুইজন অস্ত্রধারী পাহারায় রইলো।

যুবক একজন রেঞ্জার অফিসার এসে বলছে, তোমরা ব্লাডি ইনডিয়ান গুপ্তচর, তোমরা সারা জীবন সূর্যের আলো দেখবে না। সারা জীবন পাকিস্তানের কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দী থাকবে।

আমাদের দুইবেলা খাবার দেয়া হয় এবং পায়খানা–প্রস্রাবের দরকার হলে চোখ বেধে বাইরে সৈনিকদের টয়লেটে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই দিন পর রাত এগারোটার পর আমাদের একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে কয়েকজন বিরাট দেহের আকৃতির লোককে বসে থাকতে দেখি। তারা পাকিস্তান গুপ্তচর এজেন্সির লোক। তারা একটি প্রশ্নপত্র নিয়ে আমাদের নানান প্রশ্ন করতে থাকে। কি নাম, কোথায় বাড়ি, কেন পাকিস্তানে এসেছি? ইনডিয়া আমাদের কোথায় ট্রেনিং দিয়েছে, কতো টাকা দিয়েছে, আমাদের পাকিস্তানে কন্ট্রাক্টম্যান কে, পাকিস্তানের কোথায় বোম ব্লাস্ট করার জন্য এসেছি ইত্যাদি।

আমরা যতোই বলি আমরা বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক, ইনডিয়ার গুপ্তচর এজেন্সির সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তারা তা বিশ্বাস না করে আমাদের বিভিন্নভাবে শারীরিক টর্চার করতে থাকে। আমাদের আর কোনোভাবেই তারা স্বীকার করাতে পারে না যে, আমরা ইনডিয়ান গুপ্তচর।

অনেক রাতে একজন অফিসারের মতো বললেন, তোমাদের আমরা এতোক্ষণ যা করেছি তা আমাদের কর্তব্যের জন্য, আমরা বুঝতে পেরেছি তোমরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। পাকিস্তান আইন অনুযায়ী তোমাদের বিচার হবে। এরপর পানি এবং চা খেতে বলে।

এভাবে বারো দিন চলে যায়, আমরা কিছুই জানতে পারি না আমাদের ভাগ্যে কি আছে? হঠাৎ তেরোতম দিনে একজন অফিসার এসে বলে, তোমাদেরকে ইনডিয়ার বিএসএফ–এর কাছে হস্তান্তর করা হবে। কারণ তোমাদের তারা ফ্ল্যাগ মিটিং করে চেয়ে পাঠিয়েছে। কতো সন্ত্রাসবাদী ইনডিয়া থেকে পালিয়ে পাকিস্তানে যায় তাদের হস্তান্তর পাকিস্তান কখনোই করে না। আমরা বাংলাদেশি। না পাকিস্তান আমাদের বন্ধু মনে করে, না ইনডিয়া। অথচ আমরা বলি, আমরা সবার সঙ্গেই বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু তারা আমাদের ক্ষতি ছাড়া কি কখনো ভালো চায়!

পাকিস্তানের আইএসআই এবং ইনডিয়ার ‘র’ – এ দুই গুপ্তচর সংস্থা সর্বদা সচেষ্ট আমাদের এই সুন্দর ছোট বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখার জন্য। আমাদের অবশ্যই এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে থাকলে চলবে না। কারণ এরা এ ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক চলার পর জিপ এক জায়গায় এসে থেমে গেল। জিপ থেকে আমাদের নামিয়ে চোখের বাধন খুলে দেয়া হলো। তেরো দিন পর খোলা আকাশ দেখলাম, সঙ্গে ইনডিয়ার সীমান্ত। আমি বললাম, পানি খাবো।

উঠের পিট থেকে পানির কন্টেইনার এনে আমাদের পানি দেয়া হলো। পাকিস্তান–ইনডিয়া জিরো পয়েন্টে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আমাদের হস্তান্তর করা হলো। দুইজন বিএসএফ সৈনিক আমাদের নিয়ে কাটাতারের রেঞ্জের খোলা গেট দিয়ে ইনডিয়ার সীমান্তের ভেতর নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখ বেধে ফেললো এবং হাতকড়া লাগিয়ে একজন সৈনিক বুটের লাথি মেরে বললো, এই হারামজাদাদের জন্য আমাদের বিশজনের চাকরি যেতে বসেছিল। এরা পাকিস্তানের গুপ্তচর না হলে এভাবে এতো কড়া গার্ডের ভেতর দিয়ে আমাদের চোখ ফাকি দিয়ে চলে যেতে পারতো না।

কাহিনী এখানেই শেষ নয়, ভেবেছিলাম কষ্টের দিন শেষ, হয়তো মুক্তি পাবো। কিন্তু না, অনেক টর্চার হলো মানসিক, শারীরিক। প্রায় এক বছর সাত মাস জেলে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক কাহিনীর নীরব সাক্ষী হয়ে বিএসএফ–এর পুশ ইন ব্যাক–এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা সীমান্ত হয়ে বগুড়া আসি।

আমার প্রবাস জীবনের সবচেয়ে দুঃখের এ কাহিনী যায়যায়দিন পাঠকের জন্য লিখে পাঠালাম। কারণ এ দুটো দেশ থেকে অন্তত সবাই সাবধানে থাকবেন, এরা আমাদের বন্ধুবেশী শত্রু।

লতিফপুর কলোনি, বগুড়া থেকে

সেরা নাগরিক

– রাজীব আক্তার

১৯৯৬ সালের ২৪ মার্চ আমি আমেরিকার সান ডিয়েগোতে পৌছালাম। দুই ছেলে আর এক মেয়ে সেখানে থাকে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে। যেহেতু মেয়ে–জামাই আর দুই ছেলে একই বাসাতে থাকে সেহেতু আমাকে তাদের সঙ্গেই উঠতে হবে। তিন বছর জোরাজুরি করার কারণে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে এলাম। কিছুদিন এখানে–ওখানে ঘুরে দেখে বেশ ভালোই কাটছিল।

একদিন সকালে মেয়ে আমাকে বললো, বাবা, তুমি তো এখানে এভাবে থাকলে খারাপ লাগবে। তাই একটা কাজ নাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের জোরাজুরিতে রাজি হলাম কাজ নিতে। কাজে জয়েন করে দেখলাম আমাকে দারোয়ানের চাকরি দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশে আমার যে সম্মান তার কথা মনে করে প্রথম ধাক্কাতেই মিইয়ে গেলাম। তারপরও লজ্জায় কাজ করতে থাকলাম।

যেহেতু আমার বয়স সত্তর বছরের কাছাকাছি সেহেতু দুপুরের দিকে টুলে বসে থেকে ঝিমুনি এসে যেতো। আর তাতেই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কোনো কর্মচারীর চোখে পড়ে ধমক খেতাম। তখন ভাবতাম, আহারে আমার দেশ! কেন আমি দেশের সম্মান, ভালোবাসা ফেলে এই দেশে এলাম। যখন দেখতাম আমার সামনে দাড়িয়ে একটি যুবক ছেলে একটি যুবতী মেয়ে নিয়ে আদর করছে তখন

মনে হতো মানুষ না হয়ে পাথর হলেও বোধহয় ভালো হতো। ঘৃণা লাগতো ওই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি, ঘৃণা লাগতো নিজের প্রতি।

একদিন দুপুরে একটু ঝিমুনি মতো এলো। হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম। পরক্ষণেই নিজেকে ফ্লোরে আবিষ্কার করলাম। পাশে দাড়িয়ে কানাডিয়ান সেলস এজেন্ট হাসছে।

আমার টুলের পায়াতে জোরে ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফেলে দিয়েও হাসছে বদমায়েশটা। আমি আর দাড়াতে পারছি না।

সে হাত বাড়িয়ে বললো, ইজ এভরিথিং অল রাইট?

বাংলাদেশি একটি ছেলে ছিল ওই স্টোরে। সে বললো, তার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করেন।

বললাম, কি দরকার? থাক না। আমি চাকরি ছেড়ে দেবো।

আমার জমানো টাকাগুলো ছেলেকে দিয়ে বললাম, আমার দেশের যাওয়ার ব্যবস্থা করো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কেন? কি হয়েছে?

কিছু হয়নি। তুমি আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করো। দেশে যাবো।

ফ্লাইটের ডেট পড়লো। চলে আসার আগের রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় শুনলাম ছেলেমেয়ে ও জামাই কি যেন বলছে। কাছে গিয়ে শুনতে পেলাম তারা বলছে, বাবা কুড়ে মানুষ। সারা জীবন বসে খেয়েছেন, এখন তার কাজ কি ভালো লাগে? তাই তিনি দেশে চলে যাচ্ছেন।

দুই দিন আগেও সন্তানের মুখে এ ধরনের কথা শুনলে আমার সব ওলোট-পালোট হয়ে যেতো। কিন্তু হলো না। ভাবলাম সন্তান আমার হলে কি হবে, ওরা যে বিশ্বের সেরা উন্নত দেশের নাগরিক।

পাগলা, নারায়ণগঞ্জ থেকে

টাকার গরম

– মোহাম্মদ পুলক হাসান

সাবিনা আমার চাচাতো বোন। চোখের সামনে থাকলেও কখন যে লাউয়ের ডগার মতো তরতর করে এতো বড় হয়ে গিয়েছি তা টের পাইনি। নিত্যদর্শনে ওর ক্রমবৃদ্ধি তেমন করে লক্ষ্য করা হয়নি। একদিন আকাশের বুকে কালো মেঘের প্রলেপ দেখে ছাদে উঠলাম। ইতি-উতি তাকাতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়লো চার ক্ষেতের মোহনায় দাড়ানো মেয়েটির উপর। সারা শরীর নেড়ে কথা বলছে তার সমবয়সী কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আর বারে বারে ওড়না ঠিক করছে। ঝড়পূর্ব বাতাস তার শরীরের কাপড় খুলে নিতে চাচ্ছে। এবং অপরিপক্ক হাতে বালিকা তা প্রতিহত করছে। দূর থেকে তার অসমতল দেহের ভাজগুলো প্রতিফলিত রশ্মির মতো আমার চোখে এসে বিধছিল।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম সেদিকে। বাতাসের বেগ দ্বিগুণ হলে আকাশের বিরূপ মনোভাবে ছেলেরা বেশি দেরি না করেই চলে গেল। তারপর সাবিনা বাড়ি ফিরে এলো। খুব করে ওকে বকলাম। কেন জানি ছেলেগুলোর সঙ্গে ওর হাসাহাসি আমার ভালো লাগছিল না। বরং নিজেকে

রাগিয়ে তুলছিল। কয়েকটা তীর্যক মন্তব্য করার পর ও কেদে ফেললো এবং সব শেষে আমার মায়ের কাছে নালিশ করলো। এতে আমাদের দুজনের কথা বলা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

এক দিন দুই দিন করে সাত দিন চলে গেল। ও আমার দিকে ভুলেও তাকায় না। কখনো বা যদি চোখে চোখ পড়ে যায়, দ্রুত চোখ নামিয়ে নেয়। ওর এই অবহেলা আমার সরল মনে আগুন হয়ে জ্বলতে লাগলো। এক একটা দিনকে এক একটা আলোকবর্ষের সমান মনে হতে লাগলো। কোনো কিছুতেই স্বস্তি পাই না যেন। সর্বক্ষণ মনের মাঝে শুধু তার ছবি, তার ভাবনা খেলা করে। বুঝতে পারলাম আমি প্রেমে পড়ে গিয়েছি।

সাত দিনের মাথায় আর এ বাক অনশন টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। মনস্থির করলাম আজই আমার ভালোবাসার কথা বলবো তাকে।

হাতের কাছে ভালো কোনো ফুল না পেয়ে নিজেদের পুকুর থেকে কিছু কচুরি ফুল এবং ক্ষেত থেকে কুমড়া ফুল নিয়ে জানান দিলাম প্রেমের কথা। বালিকা স্বচ্ছন্দে রাজি হয়ে গেল। শুরু হলো তার ও আমার অভিন্ন রঙিন জীবন। সময়কে এখন আর অফুরন্ত মনে হয় না। বরং মাঝে মধ্যে সাবিনার সঙ্গে আড়ালে পিঠ ঘেষাঘেষি করে যখন কথা বলি তখন এক একটা ঘণ্টাকে এক মাইক্রো সেকেন্ড মনে হয়।

এদিকে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল আমরা এখন আর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করি না। উল্টো একের ভুলের পক্ষে অন্য সাফাই গাই। ব্যাপারটা সবার চোখকে ফাকি দিলেও দাদিকে এড়ানো গেল না।

একদিন আমাদের দুজনকে রকে বসে হাসাহাসি করতে দেখে দাদি বললেন,

বুড়ায় বুড়ায় কথা কয়
প্রতি কথায় কাশ
জোয়ানে জোয়ানে কথা কয়
প্রতি কথায় হাস।

আরো বললেন,

ডুবে ডুবে চোরা তুমি জল খেয়ে যাও?
উঠতে হবে ভেসে তোমার বাচতে যদি চাও!

বুঝলাম দাদি সব বুঝে গেছেন। তার কাছে কোনো কিছু লুকিয়ে লাভ নেই। সব শোনার পর দাদি অনেকটা খুশিই হলেন। তারও নাকি মনে মনে এ রকমই একটা ইচ্ছে ছিল। তিনি আমাদের সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। পাশাপাশি দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারেও সাবধনা করে দিলেন। দাদির সমর্থনে আমাদের প্রেম শক্তির ভীত আরো মজবুত হলো। এভাবেই নানান রঙে রঙিন জীবন থেকে ফুরুত করে প্রজাপতির মতো উড়ে দুটি বছর চলে গেল।

অনার্সে ভর্তি হলাম জেলা শহরের নামকরা সরকারি কলেজে। বাড়ি থেকে যাতায়াতের অসুবিধার কারণে মামাবাড়ি থেকে লেখাপাড়া শুরু করলাম। দূরে চলে এলেও মনটা পড়ে রইলো সাবিনার

কাছে। এখানে আসার পর কেবলই সাবিনাকে বিভিন্ন ছেলের দেখতে আসার খবর পাই। সুন্দরী হওয়ার কারণে পাত্রপক্ষ বিনা যৌতুকে তাদের ঘরের বৌ করতে চায়।

তখন আমাদের গ্রামে বিদেশ ফেরত কিংবা বিদেশে থাকে এ রকম পাত্রের দারুণ চাহিদা। এমনই এক প্রবাসী এসে আমার চাচার দরজায় নক করলো। দশ বছর একটানা জাপানে থেকে সম্প্রতি দেশে এসেছে। বিয়ের পর স্ত্রীকে সঙ্গে করে আবার চলে যাবে এবং বছরে একবার এসে পরিবারের সঙ্গে দেখা করবে। এমন প্রস্তাব পেয়ে আমার চাচা হাতে আসমান পেলেন যেন। কোনো কথা নেই, তার মেয়ের বিয়ে এ ছেলের সঙ্গেই হবে। যদিও সাবিনার সঙ্গে তার হবু স্বামীর বয়সের পার্থক্য অন্তত পনেরো বছর হবে!

দাদি আমার প্রসঙ্গে চাচার কানে তুললে তা ধোপে টিকলো না। কারণ আমি ছাত্র। মাত্র অনার্স পড়ছি। কবে পড়ালেখা শেষ করে প্রতিষ্ঠিত হবো তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ আশায় বসে না থেকে তার কন্যাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করতে তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। এর পটভূমিতে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে সাবিনা নামের এক সুন্দরী পাখি আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। জয়ী হলো প্রবাসীর গরম টাকা আর পরাজিত হলো আমার প্রথম ভালোবাসা।

গোপীবাগ, ঢাকা থেকে

অনেক স্টারের হলিউড

– কামরুল হাসান

ছোটবেলায় যখন অন্য দশজনের মতো পত্রপত্রিকা পড়ে হলিউডের কথা জেনেছিলাম তখন স্বপ্নেও ভাবিনি একদিন এখানে আসবো। আগস্টের ঝকঝকে রোদ মাখা দুপুরে যখন হলিউডে এলাম তখন কিছুটা হলেও পুলকিত হয়েছিলাম। সবুজ দূর পাহাড়ে শাদা কাঠের ব্লকে লেখা *হলিউড* (Hollywood) বেশ অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। আশপাশের বাসিন্দারা রোজই ঘুম থেকে উঠে এটা দেখে থাকে।

Boulevard একটি ফরাশি শব্দ কিন্তু ইংরেজিতে প্রচলিত। উচ্চারণ বুলেভা। মানে খুবই প্রশস্ত রাস্তা। রাজধানী ঢাকায় সম্ভবত মানিক মিয়া এভিনিউকে বুলেভা বলা যেতে পারে। হলিউড বুলেভা–তে গাড়ি ঢুকতেই আমার বন্ধু দেখালো ম্যানার্স চায়নিজ থিয়েটার। বিখ্যাত সিনেমা হল। এর সামনের চত্বরে হলিউডের বিখ্যাত সব তারকাদের হাতের ছাপ আর পায়ের ছাপ।

অসংখ্য টুরিস্টদের পদচারণায় মুখরিত ম্যানার্স চায়নিজ থিয়েটার। হলিউড বুলেভার দুই দিকে *ওয়াক অফ ফেম* রাস্তার দুই পাশে বিখ্যাত সব তারকাদের নামাংকিত স্টার। এর ওপর দিয়ে লোকজন হেটে যাচ্ছে। কেউ কেউ তার প্রিয় তারকার নামাংকিত স্টার–এর ওপর বসে ছবি তুলছে।

লস এঞ্জেলেসের পুরনো এলাকা হলিউড। সিনেমা হল, স্টুডিও, গিফট শপ, হোটেল এগুলো নিয়েই গড়ে উঠেছে। হলিউড বুলেভার দুই ধারে সারি বেধে পামট্রি লাগানো। রাতে পামট্রি–র গায়ে সবুজ আলোগুলো জলে উঠলে বেশ সবুজ শ্যামলের মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়। চমৎকার লাগে দেখতে।

ম্যানার্স চায়নিজ থিয়েটার–এ গিয়ে খুজছিলাম কারোর পায়ের ছাপ, হাতের ছাপ বা স্বাক্ষরের এর পাশে বসে ছবি তুলবো। খুজে পেলাম এন্থনি কুইনের স্বাক্ষর। আমার অত্যন্ত প্রিয়। তার *লায়ন অফ*

দি ডেজার্ট ছবিটি খুব ভালো লেগেছিল। লিবিয়ার পটভূমিতে নির্মিত ছবিটিতে একজন আরব মুসলমান যোদ্ধা ওমর মোক্তার–এর চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন।

একটু দূরে দাড়িয়ে আছে মেরিলিন মনরোর আবক্ষ মোমের মূর্তি। সেই হাসি আর সেই মনোরম ভঙ্গিমা। তবে তারচেয়েও অবাক করা কাণ্ড ঘটলো সেদিন দুপুরে। বাস থেকে নেমে একটু ভিড়, জটলা দেখে এগিয়ে গেলাম। লোকজন সুন্দর সারি রেখে দাড়িয়ে আছে। আজ অভিনেত্রী শ্যারন স্টোন আসবেন। চলচ্চিত্রে তার অসাধারণ অবদানের জন্য আজ তাকে স্টার দেয়া হবে। দেয়া হবে লাল গালিচা সংবর্ধনা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ঠিক ঘড়ির কাটা ধরে তিনি চলে এলেন। কৃম কালারের সুট পরিহিতা লাস্যময়ী নায়িকা। হেসে সবাইকে অভিনন্দন জানালেন। উদ্যোক্তারা দুই চার কথা বললেন। তারপর শ্যারন স্টোন তার নামাংকিত স্টারটি উন্মোচন করলেন ওয়াক অফ ফেম–এ। হাতের ছাপ দিলেন ও জুতো খুলে পায়ের ছাপ এবং সবশেষে স্বাক্ষর করলেন কাচা সিমেন্টের ওপর। মোটামুটি আধঘণ্টায় পুরো অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে গেল।

এরপর থেকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখতাম ম্যানার্স চায়নিজ থিয়েটার–এর ব্যানারগুলোর ওপর কখন কোন ছবির পৃমিয়াম শো হবে, কোন অভিনেতা–অভিনেত্রী আসবেন স্টার নিতে এগুলো জানানো থাকতো। এভাবেই দেখতে পেলাম জন ট্রাভোল্টাকে। ছবির পৃমিয়াম শো উপলক্ষে এসেছিলেন ম্যানার্স চায়নিজ থিয়েটারে কালো সুট পরে *স্যাটারডে নাইট ফিভার*–এর সেই ডিসকো ডান্সার তারকা। দেখলাম টিভি সিরিয়াল ম্যাগনাম পিআই–এর টম সেলেককে।

আরো মজার ব্যাপার হলো, হলিউড কৃসমাস প্যারেড। ডিসেম্বরের ২০ তারিখে প্রতি বছর হলিউড বুলেভাতে *হলিউড কৃসমাস প্যারেড* হয় ঠিক সন্ধ্যায়। সারা দিন টুরিস্টরা এবং আগ্রহী লোকজন রাস্তার দুই পাশে জায়গা নিয়ে বসে থাকে। পপ কর্ন আর ড্রংকস খায়। গল্পগুজব করে।

বিকাল থেকেই হলিউড বুলেভা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে প্যারেড–এর জন্য। এই প্যারেড–এর আকর্ষণ, হলিউডের অনেক নামি–দামি তারকার অংশগ্রহণ। লস এঞ্জেলেসের হালকা শীতে আলো ঝলমল হলিউড বুলেভাতে ঠিক সন্ধ্যা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারেড শুরু হলো। মিউজিক লাইট অ্যাকরোবেটিং দলের মধ্যমণি হয়ে একেকজন স্টার–এর গাড়ি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। ভারী সুন্দর। এগিয়ে এলেন *বেওয়াচ* খ্যাত ডেভিড হাসে হফ, টনি ডেনজা।

দেখা হলো, এলেক্স হ্যালির রুটসের সেই বিখ্যাত কিনটা কিনটের সঙ্গে। মানে অভিনেতা লেবার বাটনের সঙ্গে। মনে পড়ে, রুটসে তার হৃদয়স্পর্শী অভিনয় দেখে টিভির সামনে বসে অনেকেই চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। তবে রুটসের সেই লেবার বাটন নেই। সেই তারুণ্য গত হয়েছে। লেবার বাটনের বয়স বেড়েছে। তার সঙ্গে কিনটা কিনটেকে মেলালো ভার।

হলিউড স্টুডিওপাড়া। এখানে আছে ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, প্যারামাউন্ট পিকচার্স আর অন্য সব স্টুডিও। তবে টুরিস্টদের ভিড় ইউনিভার্সাল স্টুডিওতেই। ঢুকেই স্টুডিও টুর। ছোট খোলা রেলগাড়িতে পুরো স্টুডিও টুর। সঙ্গে গাইড। গাড়িতে বসে সব দেখতে দেখতে যাচ্ছি। হঠাৎ গাইড গাড়ি থামালেন।

দেখুন, এই সেই বৃষ্টি ভেজা জায়গা, এখানে দাড়িয়ে পঞ্চাশ বছর আগে মেরিলিন মনরো বৃষ্টিতে ভিজেছিলেন। বলতে বলতে দুই দিক থেকে কৃত্রিম বৃষ্টি নেমে এলো। কিছুটা মেঘের আভা, আমাদের গায়েও বৃষ্টির ছাট এসে লাগলো। তারপর বন্যার দৃশ্য কিভাবে করা হয় বোঝাতে বন্যার পানিতে সমস্ত এলাকা ভেসে গেল। সবই টেকনিকাল ব্যাপার।

গাইড থেমে বললেন, এবার আমরা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেবো। *টেন কম্যান্ডমেন্টস* ছবিতে প্রফেট মোজেস সাগরকে লাঠি উচিয়ে দুই ভাগ করে দিয়েছিলেন এবং তার অনুসারীরা নির্বিঘ্নে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন।

গাড়ি এগিয়ে চললো পানির ওপর দিয়ে। হঠাৎ পানির নিচ থেকে স্টিলের পাটাতন ভেসে উঠে পানিকে দুই ভাগ করে দিল। এবং আমাদের টুর কার তার ওপর দিয়ে দিব্বি পাড় হয়ে গেল। সব টেকনিকাল ব্যাপার।

দেখলাম ফল গাই–এর সেই বৃজ। ষাট দশকের ল্যাসি সিরিয়ালের সেই ঘর। নাইট রাইডার–এর সেই বিখ্যাত গাড়ি। গাড়িতে বসে নায়কের মতো পোজ দিয়ে কেউ কেউ ছবি তুললো। চলন্ত গাড়ির সামনে কিং কং–য়ের সেই গরিলা চিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

JAWS (জস) খ্যাত সেই হাঙরটি পানি থেকে লেজ উঠিয়ে আমাদের জানান দিল, আমিও আছি, হারিয়ে যাইনি।

আট দশমিক পাচ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প হলে কেমন হবে সেটা দেখানো হলো। ভাঙা বাড়ি–ঘর, পানির পাইপ, আগুন। অনেকটা বাস্তবের ছোয়া দিতে চেষ্টা করা। স্টুডিওর টেকনিকাল ব্যাপারগুলো খুবই উন্নতমানের।

দেখলাম কিছু কিছু ছবির শুটিং হচ্ছে। ফিরে আসার পথে চোখে পড়লো স্টিভেন স্পিলবার্গের বিখ্যাত অস্কার পাওয়া ছবি শিন্ডলার্স লিস্ট ছবির পোস্টার। ছবিটি এখানে তৈরি। ব্যাংকক–এর সিনেমা হলে বসে ছবিটি যখন দেখেছিলাম তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি একদিন এই ছবির শুটিং স্টুডিও দেখতে পাবো।

quamrulhassan@hotmail.com
টরন্টো, কানাডা থেকে

জেদ

– বীরাঙ্গনা

আমার মা–বাবার বিয়ের বিশ বছরের সাধনার অতি আকাঙ্ক্ষিত সন্তান আমি। বিশটি বছর পর আমি এলাম সব আলো করে। কতো আদরের আমি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আব্বার পৃথিবী শুধুই আমাকে ঘিরে। শিক্ষা–দীক্ষায়, হাতের কাজে সব দিকেই আব্বা আমাকে পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন। আব্বার ইচ্ছামতো আমি হলাম একজন শিক্ষিকা। পড়ালেখার পাশাপাশি একটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা এবং পরবর্তীকালে গুলশানেই একটি সাহায্য সংস্থার জুনিয়র হাই স্কুলে পৃন্সিপালের চাকরি পেয়ে গেলাম কর্মদক্ষতার গুণে।

জীবনে কখনোই কোনো অভাব বা কষ্টবোধ করিনি। চাওয়ার আগেই সব পেয়ে যেতাম। কিন্তু আমার ব্যক্তি জীবনে হৃদয়ে ছিল প্রচণ্ড কষ্ট। সে কষ্ট থেকে জন্ম নেয় জেদ যা পুষে রেখেছিলাম অগোচরে হৃদয়ের গভীরে। কষ্টের গল্প অন্যদিন লিখবো। জেদ ছিল, এ দেশে থাকবো না এবং সে চেষ্টাই চলছিল। সে সুযোগও পেয়ে গেলাম। গোপনে দেশত্যাগ করার সব রেডি হয়ে গেল। অর্থের যোগান দিতে তেমন বেগ পেতে হলো না। নিজের বেশ কিছু টাকা জমা ছিল। সামান্য দেনা করেছি।

শুধু আব্বার জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আমাকে তো কখনোই চোখের আড়াল হতে দেননি। আব্বা যদি আমার শূন্যতা সহ্য করতে না পারেন! কিন্তু আমি যা করতে চাই তা তো আমার করা চাই–ই। ফ্লাইট ডেট ওকে হয়ে গেছে। আব্বা মাকে কথাটা জানালাম। শুনেই মায়ের কান্নাকাটি এবং আব্বা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

ফ্লাইটের আগের দিন স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে দুই মাসের ছুটি নিয়েছি বেতন ছাড়া। আব্বাকে অনেক বোঝালাম। অসুবিধা হলে দেশে ফিরে চাকরিতে যোগ দেবো। সুযোগ–সুবিধা পেলে হয়তো কোনো দেশে থাকবো।

আব্বা মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, বাবা (মেয়ে হলেও আব্বা আমাকে আদর করে বাবা ডাকতেন), তোমাকে ছাড়া আমি পৃথিবী দেখতে পাই না। তোমাকে ছাড়া আমি অসহায়, অচল। তবুও যেতে চাও, যাও। দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমার সহায় থাকেন। বাঙালি মেয়ের জন্য বিদেশ কঠিন জায়গা। একা একা সাহস যখন করেছো তখন সব আল্লাহর হাতে।

১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অন্য দেশে দেশে কিছুদিন চাকরি করে অবশেষে কাগজ পাবার আশায় ইটালি এলাম। আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড গৃসে থাকে। যাবার কথা ছিল তার কাছে। কিন্তু ইটালি এসে আর যাবার কোনো ব্যবস্থা করতে না পেরে এখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে বলা প্রয়োজন, গৃসে আমার ফ্রেন্ডের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সাজেশনই আমাকে ইওরোপ আসতে উৎসাহী এবং সাহসী করে তোলে।

আরেক কঠিন জীবন। হাতের ডলার সব শেষ। বিদেশি বান্ধবীর বাসায় সিট ভাড়া করে থাকি। কিন্তু ভাড়া দিতে পারি না। খাবার কেনার পয়সা নেই। একবেলা আধা পেট খাই তো অন্য বেলায় উপোস থাকি। দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ বন্ধ। হাতে পয়সা নেই। ফোন করা সম্ভব নয়। একদিন নিরুপায় হয়ে বান্ধবীকে গলার চেইন, ঘড়ি, আংটি এবং শখের ক্যামেরাটা দিয়ে বললাম, আপাতত তুই এগুলো রাখ। পরে চাকরি পেলে তোর সব পাওনা দিয়ে দেবো। তার সঙ্গে আমি ইংরেজিতে কথা বলতাম। সে অল্প ইংরেজি পারতো।

বান্ধবী আমার হাতে জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুই মন খারাপ করবি না। যতোদিন তোর চাকরি না হয় ততোদিন তুই ভাড়া দিবি না এবং আমার সব জিনিস তোর মনে করে খাবি।

গৃস থেকে আমার ফ্রেন্ড তিনশ মিলা পাঠিয়েছিল পাসপোর্ট করার জন্য। তখন পাসপোর্ট করতে আশি মিলা লাগতো। বান্ধবীর মাধ্যমে এক বাঙালিকে পাসপোর্ট বানাতে দিলে সে পুরো তিনশ মিলাই হজম করেছিল। বিনিময়ে আমার পাসপোর্টে একটা ভুল ঠিকানা বসিয়ে দিয়েছিল যার খেসারত আজো বয়ে চলেছি। তবু সৌভাগ্য, পাসপোর্টটা দিয়েছিল। এরপর নতুন পাসপোর্ট করে

ডকুমেন্ট বা কাগজ জমা করতে চেয়েছিলাম। তবে কাগজ পেতাম না। তাই ভুল ঠিকানায়ই কাগজ করেছি।

এরও দুই তিন মাস আরেক বিদেশি বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। খুব ভালো ইংরেজি বলতো। তার সঙ্গে সব কথা বলতে পারতাম। এই বান্ধবীর সহযোগিতায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে, মা–বাবার দোয়ায় একটা চাকরি জুটে গেল ফুলটাইম। কিন্তু বেতন পার্টটাইমেরও কম। কারণ আমি ভাষা জানি না, অভিজ্ঞতা নেই। তবুও আমার জন্য সোনার হরিণ।

কোনো রকম খেয়েপরে দিন যাচ্ছে। দেশের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। আব্বা আমার চিন্তায় বিছানায় শয্যাশায়ী। মা কেদে কেদে চোখ নষ্ট করছেন। সারা দিন কাজ করি, রাতে নামাজ পড়ে আব্বার জন্য কান্নাকাটি করি। কাগজ পাবো পাবো বলে আর পাইনি। তাই দেশেও যাওয়া হয় না। এর মাঝে বান্ধবীর বাসায় অন্য ব্যাপারে পুলিশ আসা–যাওয়া করে, সবার বৈধতার কাগজপত্র দেখে। আমার অবস্থা খারাপ। কাগজ নেই। বান্ধবী আমাকে নিরুপায় হয়ে অন্যত্র কিছুদিন সরে থাকতে বললো। কোথায় যাবো? চিন্তায় মাথায় খারাপ হওয়ার অবস্থা।

বুদ্ধি করে আমার মালিককে বললাম সমস্যার কথা। মহিলা বুঝতে পেরে তার অন্য একটা ফ্ল্যাট বাড়ির চাবি এনে দিয়ে বললেন, আজই থাকতে পারিস খালি পড়ে আছে।

খুশিতে কেদে ফেলেছিলাম। একা একটা বড় ফ্ল্যাট। রোমের অদূরে পাহাড়ি এলাকা। কর্মস্থলের পাশাপাশি। বাস টিকেট কিনতে হবে না।

বাসায় ফিরলেই প্রচণ্ড কান্না পেতো। মনে হতো আমি বন্দী হয়ে আছি। চিনি না, জানি না, কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি না।

মধ্যরাতে ঘুম ভাঙলে মনে হতো পৃথিবীর সব ভূত–পেত্নি, দৈত্য–দানব এসে এই ফ্ল্যাটে অবস্থান করছে। আমি টয়লেটে কিংবা কিচেনে গেলেই আমাকে গলা টিপে ধরবে। কখনো কখনো খাটের তলায়ও দুই একটা ভূত আছে বলে মনে হতো। *আয়াতুল কুরসি* জপতাম আর ভোর হওয়ার আশায় চোখ বন্ধ করে আল্লাহকে ডাকতাম। প্রায়ই রাতে ভয়ে ঘুম হতো না। মনের অবস্থার অবনতি হতে লাগলো। আব্বা অসুস্থ, এদিকেও কিছু তেমন একটা হচ্ছে না দেখে একবার ভাবলাম দেশে ফিরে যাবো আবার ভাবলাম, একটা ছেলে মানুষ যা পারে না, আমি একটা মেয়ে মানুষ হয়ে আল্লাহর রহমতে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছি এই বিদেশের মাটিতে। এখন কাগজটা হলেই আমার সব কষ্ট সার্থক। তাই মনে শক্তি সঞ্চার করলাম।

কয়েকদিন স্বপ্নে উল্টাপাল্টা দেখি। রাতে মোটেও ঘুম হয় না। বুকের ভেতর হাহাকার। সন্তানের জন্য পিতার তৃষ্ণার্ত অসহায় মুখ বার বার ভেসে উঠতো চোখের সামনে।

ঢাকায় ফোন করলাম। মামি বললেন, আব্বার অবস্থা খারাপ। তাই সবাই গ্রামের বাড়ি গেছেন অন্য শহরে। সেই শহরে অর্থাৎ গ্রামের বাড়িতে আমাদের এক ভাড়াটিয়ার বাসায় ফোন করলাম। ভাবী ফোন ধরলেন, বাংলাদেশ টাইম রাত একটা বাজে।

ভাবীকে আব্বার কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

ভাবী বললেন, না... তেমন কিছু না। খালু একটু অসুস্থ এই আর কি!

আমার মনের খবর তো আমি জানি।

বললাম, ভাবী, মিথ্যা বলার দরকার নেই। আব্বা কবে, কখন চলে গেলেন শুধু জানতে চাই।
জানলাম, চার দিন আগে আব্বা তার অতি আদরের ধন তার চোখের মণি এ সন্তানকে দেখার জন্য ছটফট করে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। আমি আর কিছু বলতে পারিনি। সারা রাত পাথরের মতো বসেছিলাম। দুই তিন দিন চাকরিতে যাইনি, খাইনি, কারো সঙ্গে কথা বলিনি।
দেশে আর যাবো না ভেবেছিলাম। মায়ের চিঠি এলো। মা লিখেছেন, বাবা, তুমি দেশে না এলে তোমার আব্বার মতো আমাকেও আর দেখবে না।
অবশেষে দেশে গেলাম। আমাদের বাসার বিরাট সীমানার শেষ প্রান্তে বাগানে আব্বা শুয়ে আছেন। মসজিদের আজান আব্বা স্পষ্ট শুনতে পান। মায়ের বিধবা সাজ, সংসারের শূন্যতা সহ্য করতে পারছিলাম না। আবার বুক ফাটা চিৎকারে আকাশ–বাতাস ভারী করে তুলেছিল।
আব্বার কবরের পাশে যেতে পারিনি। দূরে দাড়িয়ে আর্ত চিৎকার করেছি, হাহাকার করেছি। আব্বা আব্বা বলে আর্তনাদ করেছি। আব্বার সেই সুন্দর মুখ আর কোনোদিনও দেখতে পারবো না। অমন সুস্থ, সবল, সুন্দর সাবেক পুলিশ অফিসার আব্বা মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। তবে কি আমার দূর দেশে অবস্থানই আব্বাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে?
আব্বার সঙ্গে স্বপ্নে দেখা হয়, কথা হয়। আর তা আমাকে প্রতিনিয়ত কাদায়।

রোম, ইটালি থেকে

বিদেশিনী

– রাজিব ফেরদৌস

কোরিয়ায় দীর্ঘ দশ বছর থাকার পর আমার বড় ভাই মকবুল হোসেন দেশে ফিরছেন। এ উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে ফেলা হলো। আমার তিন বোন যারা যথাক্রমে ময়মনসিংহ, বগুড়া এবং সিলেট থাকে তারা স্বামী–সন্তান নিয়ে হাজির হলো। আমার এক খালা যিনি রাজশাহীতে থাকেন তিনিও খালুজানকে নিয়ে হাজির। আগে থেকেই বাবা পোলাও, কোর্মা এবং মুরগির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। দুটো বিশাল সাইজের কাতল মাছ আনা হলো বাজার থেকে। গত বছর বাবা হাই স্কুলের শিক্ষক পদ থেকে অবসর নেয়ার পর আমাদের সংসারে খুব টান যাচ্ছে। আমি পড়াশোনার ফাকে ফাকে টিউশনি করে যা রোজগার করি তা দিয়ে সংসার চলে কোনোমতে।
বাবার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস। কিন্তু প্রায় সময়ই তার কাছে টাকা থাকতো না। তিনি মায়ের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে আমার কাছ থেকে পাচ দশটা করে টাকা নেয়াতেন। মা লজ্জায় আমার কাছে টাকা চাইতে পারেন না। যে ছেলেকে তারা এতোদিন পরিশ্রম করে রোজগার করে বড় করেছেন তার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা!
মনে মনে অবাক হতাম। মাকে লজ্জা দিতে চাই না। তিনি যখন টাকা চাওয়ার আগে কোনো নাটক সাজাতে থাকতেন তখন দশটা টাকা তার হাতে গুজে দিয়ে নাটকের মোড় ঘুড়িয়ে ফেলতাম। মা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তারপর টাকা নিয়ে নীরবে উঠে চলে যেতেন। আমি

নিশ্চিত, মায়ের চোখে তখন জল টলমল করতো। হয়তো দুই এক ফোটা ঝরেও পড়তো। তাকে তখন পেছন দিক থেকে দেখতাম বলেই হয়তো ধরতে পারতাম না।

সংসারের যখন এই অবস্থা তখন আমাকে না জানিয়েও পোলাও, মাছ, মুরগির ব্যবস্থা বাবা কিভাবে করলেন এটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুললো। প্রথমবারের মতো মনে হয়েছিল, সংসারের অনেক খবরই আমি রাখি না। আমার মা দুপুর থেকে শুরু করে রাত আটটা পর্যন্ত আগুনের তাপে শরীর পুড়ে মাছ, মুরগি, পোলাও রান্না করলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার তিন বোনের একজনও রান্নাঘরে এসে একবার উকিও দিল না। যে যার স্বামী–ছেলে নিয়ে ব্যস্ত। খালার সাইজ হাতির মতো বিশাল। তিনি বারান্দায় মোড়া পেতে বসে পান চিবাচ্ছেন সেই সকাল থেকে। পান আনার ভয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতো। তিনি খালুজানকে দিয়ে পান আনিয়ে নিচ্ছেন একটু পর পর। খালুজান পান এনে দিয়ে খালার পাশে বসে থাকেন। অপেক্ষা করেন আবার কখন পান শেষ হয়।

আমি গেলাম সদর বাজারে। সেখানে এক ফোন ফ্যাক্সের দোকানে রাত নয়টা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ভাইয়া দেশে নেমেই ফোন করবেন। তারপর সোজা বাড়ি চলে আসবেন। দুই সপ্তাহ আগে তার একটি চিঠি থেকে আমরা এটাই জেনেছি। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, ভাইয়া আজ দেশে এলেও বাড়ি আসবেন না। ঢাকায় কোনো হোটেলে রাতে থেকে সকালে রওনা হবেন। শুধু তার আসার পথে চেয়ে কয়েকটা মানুষ রাত জেগে বসে থাকবে।

সে রাতে ভাইয়া এলেন না, ফোনও করলেন না। আমরা সারা রাত না খেয়ে তার জন্য জেগে থাকলাম। যা রান্না হয়েছিল তা তেমনি থাকলো। যার জন্য রান্না হয়েছে তাকে ছাড়া খাই কি করে!

হঠাৎ কিছু ভাবনা রাতের শেষ দিকে আমাকে এলোমেলো করে দিয়েছিল। যার জন্য এতো কিছু, এতো আয়োজন সে এই দশ বছরে আমাদের অভাবের সংসারে দশ হাজার টাকাও পাঠায়নি। বাবা তার সমস্ত জমি আর মা তার শেষ সম্বল বিয়ের গয়নাগুলো বিক্রি করে যে আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভাইয়াকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন তার বিনিময়ে সে কি দিয়েছে তাদের?

আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভাইয়া এলেন পরদিন বিকেলে। অবাক হওয়ার কোনো কথা ছিল না। কিন্তু ভাইয়া আমাদের অবাক হতে বাধ্য করলেন। তিনি বিয়ে করে এক বিদেশিনীকে নিয়ে এসেছেন। সেই মহিলা অসম্ভব ফর্শা। তবে তার সারা মুখে আশ্চর্য এক ধরনের মায়াবী ভাব।

এতোদিন পর ভাইয়া এলেন। মা একটু তাকে জড়িয়ে ধরে কাদবেন, বাবা একটু বড় ছেলের সঙ্গে সংসারের অবস্থা নিয়ে কথা বলবেন, আমরা রাত জেগে তার কাছ থেকে বিদেশের গল্প শুনবো, এসবের কিছুই হলো না। প্রেশার বেড়ে গিয়ে মা বিছানায় পড়লেন। বাবা অধিক শোকে পাথর হয়ে গেলেন। গভীর রাতে মায়ের কান্না শুনতে পাই।

বাবা ফিশ ফিশ করে বলেন, সে আমাদের মকবুল নয়, সে অন্য কেউ। কোথায় যেন বিরাট ভুল হয়ে গেছে রহিমা। বিরাট ভুল হয়ে গেছে।

এসবের দিকে ভাইয়ার কোনো খেয়াল নেই। সে সারাক্ষণ বিদেশিনীকে নিয়ে ব্যস্ত। খুব প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে কোনো কথাও হয় না তার। তবে বিদেশিনীকে দেখতাম আমাদের প্রতি কিছুটা

আগ্রহী। ভাইয়া কোনো কারণে বাইরে গেলে তিনি বাবা মায়ের ঘরে চলে আসতেন। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলতেন, *খেমন আছেন আপনি?*

মা কোনো কথা বলতেন না।

বাবা কড়া গলায় বলতেন, এই মেয়ে যাও, ঘরে যাও। এখানে আসবে না কখনো।

বিদেশিনী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন বাবার দিকে। তার চোখে মুখে মায়া ছিল। সেদিকে তাকালে সব রাগ ঝরে যেতে বাধ্য।

দিন যতোই যেতে থাকলো ততোই আমাদের সবাইকে বিদেশিনী আপন করে নেয়ার চেষ্টা করতে থাকলেন। অবশ্য সবই করতেন ভাইয়ার অগোচরে। আমাদের সঙ্গে মিশতে দেখলে ভাইয়া তাকে বকাঝকা করতেন। তবুও তিনি মিশতেন। মা বাবাও তাকে একটু একটু করে মেনে নিতে থাকলেন সম্ভবত তার ব্যবহারের কারণেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিদেশিনী এরই মাঝে চুলায় ভাত রান্না আর চা তৈরি করা শিখে গেছেন। বাবাকে তিনি প্রায়ই বিকেল বেলা চা করে দিতেন। রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে টুকটাক সাহায্য করতেন।

প্রায় দুই মাস বাড়িতে থাকার পর ভাইয়া কোরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিদেশিনী বেকে বসলেন। তিনি কোরিয়া যাবেন না, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ভাইয়া অনেক বোঝালেন। আমরাও বোঝালাম, এখানে থাকলে তার কষ্ট হবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি নন। ভাইয়া পড়ে গেলেন মহামুশকিলে। কোরিয়ায় না গেলে তার নাকি অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত বিদেশিনীকে রাজি করানো গেল। তবে এখন নয়, তিনি যাবেন আরো পাচ মাস পর। এ পাচ মাস তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। উপায় না দেখে ভাইয়া রাজি হলেন। বিদেশিনীকে রেখে ভাইয়া চলে গেলেন।

এরপর থেকে বিদেশিনীকে আমরাও আপন করে নেয়ার চেষ্টা করতে থাকলাম। তার প্রতি আমাদের সকল সন্দেহ, ভুল ধারণা ভেঙে যেতে থাকলো ধীরে ধীরে। বাবা মা তাকে *বৌমা* বলে ডাকা শুরু করে দিলেন। আমিও ভাবী বলে ডাকি।

একদিন রাতে আমি পড়তে বসেছি। বিদেশিনী আমার ঘরে এসে চৌকিতে বসলেন। মনে হচ্ছিল তিনি কিছু বলবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবেন?

তিনি কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে বললেন, আমি থেকে গেলাম বলে কি তোমরা রাগ করেছো?

ততোদিনে তিনি পুরো বাংলা বলা শিখে গেছেন।

বললাম, না, তা কেন হবে? আমরা খুশি, সবাই খুশি।

বিদেশিনী এবার জড়ানো গলায় বললেন, ওখানে আমার কেউ নেই। মা–বাবা মারা গেছে সেই কবে। তাদের কথা মনেই পড়ে না। মানুষ হয়েছি মামার ওখানে। যখন বড় হলাম বুঝতে শিখলাম তখন মা বাবার জন্য আমার মন কাদতো। এখানে আমি মা–বাবা পেয়েছি। আমার মন আর কাদে না। আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না। তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিও না, প্লিজ!

বিদেশিনী আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। আমি তার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে ফেললাম। এতো মায়াবী মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। বুক কেপে ওঠে।

মায়ের অসুখ দিন দিন বাড়তে থাকলো। বাবার শরীরও ভালো যাচ্ছে না। তিন বেলাই বিদেশিনী আমাদের রান্না করে খাওয়াতেন। রান্নাও করতেন ভালো। মাঝে মধ্যে মনে হতো তিনি এ দেশেরই কোনো সাধারণ মেয়ে। আবার নিজের মনেই প্রশ্ন জাগতো, এ দেশের কতোজন মেয়েই বা শ্বশুরবাড়ির সংসারকে এতো আপন করে নিতে পারে?

পাচ মাস পর ভাইয়া এলেন বিদেশিনীকে নিতে। তিনি এবার আপত্তি করলেন না। তবে কথা দিয়ে গেলেন কোরিয়া গিয়েই বাবা মাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তা না হলে তিনি আবার চলে আসবেন এ দেশে। যাবার দিন বিদেশিনী হাউ মাউ করে কাদতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাও কাদলেন। বাবা কঠিন মানুষ। সারা জীবন শিক্ষকতা করেছেন। তাকে আমি কোনোদিন কাদতে দেখিনি। সেদিন তিনিও কাদলেন। এক অবিচ্ছেদ্য মায়ার বাধনে সবাইকে বেধে দিয়ে বিদেশিনী চলে গেলেন।

তারপর পার হলো আরো পাচ বছর। এর মাঝে মা মারা গেলেন। তার কঠিন অসুখ হয়েছিল। মাঝে মধ্যে তীব্র শ্বাসকষ্ট হতো। বাবা তার হাত শক্ত করে ধরে বলতেন, রহিমা আর একটু সবুর করো, আর কয়েকটা দিন। বৌমা খবর পাঠিয়েছে আমাদের সামনের মাসেই কোরিয়া নিয়ে যাবে। ওখানে তোমার ভালো চিকিৎসা করাবো। তুমি ভালো হয়ে যাবে।

বাবার কথা ছিল নিছকই সান্ত্বনা। কারণ বিদেশিনীকে নিয়ে যাবার পর ভাইয়ার সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, কাজ হয়নি। তা থেকেই বুঝে নিয়েছি তারা ঠিকানা পাল্টিয়েছে। আমি অবাক হয়েছি বিদেশিনীর কথা ভেবে। অন্তত তিনি তো একবার আমাদের খোজ নিতে পারতেন। মানুষ এতোটা বদলে যায় কিভাবে?

মিরপুর, ঢাকা থেকে